

তৃতীয় অধ্যায়

প্রযোজক ও নির্দেশক রূপে শব্দ মিত্র

আমরা জানি অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন প্রযোজক। নাট্যকার ও প্রযোজকের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন—

“নাট্যকার যদি হন ধ্যানী, প্রযোজক হচ্ছেন সেই ধ্যানের রূপকার—একাধারে ধ্যানী ও যোগী। নাট্যকারের ধ্যানকে নিজের ধ্যানে পরিণত করে সেই ধ্যানকে নিখুঁতরূপে ব্যক্ত করার দায়িত্ব যাঁর তাঁর গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।”^১

নাট্যকারের নাট্যের ধ্যানকে নাট্যায়িত করার জন্য প্রযোজককে হতে হয় বহু শাস্ত্রবিদ ও বহু কলাবিদ। মহাকাবি কালিদাস তাঁর ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকের সূচনায় সূত্রধারের মুখ দিয়ে জানিয়েছেন—

“আপারিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।”^২

এর অর্থ ‘বিদ্বানদের পরিতুষ্টি সাধনের জন্য প্রযোজককে নানা বিদ্যায় পারঙ্গম হতেই হবে।’ নাট্যাচার্য ভরত ছিলেন একজন বিচক্ষণ প্রয়োগবিদ। তার জন্য তাঁকে হতে হয়েছিল বহু শাস্ত্র ও কলায় পারদর্শী। অভিনয়ের কলা-কৌশলের পর্যালোচনা তাই তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। প্রযোজককে বিশেষভাবে জানতে হবে দৃশ্যসজ্জা, অঙ্গরচনা, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্য, আলোক সম্পাত, শব্দক্ষেপের কৌশল এবং অভিনয়—এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন ও প্রাজ্ঞ। নৃত্য ও সংগীত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতা না থাকলে প্রযোজকের পক্ষে নৃত্য-নাট্য ও গীতি-নাট্যের প্রয়োজনা অসম্ভব। তেমনি একজন প্রযোজকের আলোক সম্পাত দৃশ্য সন্নিবেশ অঙ্গরচনা প্রভৃতি সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, একজন প্রযোজককে সব যুগের নাট্য প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে প্রাজ্ঞ হতে হবে, জানতে হবে। শুধু তাই নয়, একজন প্রযোজককে দেশ ও বিদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানতে হবে। সব যুগের ইতিহাস, ভৌগোলিকতা, ধর্মচর্চা, ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য, ভাষা, সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তা না হলে প্রয়োজনা কর্মে কালানৌচিত্য দোষ ঘটান সম্ভাবনা

থেকে যেতে পারে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, একজন অশিক্ষিত প্রযোজকের পক্ষে কোনমতেই ভালো নাট্য প্রযোজনা সম্ভব নয়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য প্রযোজককে একজন দক্ষ রাঁধুনীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—

“একজন রাঁধুনীর কাজ যে রকম তার কাছে তেল মশলা নুন, দই, সব জিনিসপত্র এনে দিয়ে তাকে বলা হয় যে, আপনি রান্নাটা ভালো করে দিন, এবং এই সমস্ত জিনিস জোগাড় করার পরে রান্নাটা ঠিক হওয়ার Ultimate responsibility সেই রাঁধুনীর ওপর পরে। একজন প্রযোজকের কাজ ঠিক সেই রকম, তার কাছে লাইট, মিউজিক, সাউন্ড, নাটক, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা আছেন। এখন স্বভাবত যে জিনিসটা দাঁড়ায় তা হচ্ছে যখন মাংস রান্না করার জন্য দই পাওয়া যায় না, তখন তেঁতুলের রস দিয়ে তার অভাব পূরণ করতে হয়। তেমনি করে একজন বুদ্ধিমান প্রযোজক তিনি যে করেই হোক সেই অভাবটিকে ঠেকান, তিনি বিভিন্নভাবে প্লেয়ারদের দুর্বলতা, মিউজিকের দুর্বলতা, লাইটের দুর্বলতা, সেটের দুর্বলতা ইত্যাদিগুলোকে ঢাকবার চেষ্টা করেন। আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, অধিকাংশ সময়েই যতটা প্রকাশ করতে পারি তার থেকে বেশী এনার্জি চলে যায় ঢাকবার দিকেই। কিন্তু এই ঢাকাটা শিল্পেরই একটি অন্যতম শর্ত। যা কিছু সম্পূর্ণ সেটাকে প্রকাশ করা—যা কিছু অসম্পূর্ণ যা কিছু ঠিক মতো প্রকাশিত হলে সম্পূর্ণতাকে খর্ব করে, যেটাকে ঢেকে ফেলা সেটা শিল্পেরই কাজ। সেই হিসেবে একজন প্রযোজকের কাজ, স্বতন্ত্র ধরণের এবং বেশ বড় ধরণের। তাকে মনে মনে দর্শকের আসনে বসতে হয়। তিনি মনে মনে নানা ধরণের দর্শক হিসেবে নানাভাবে নিজেকে কল্পনা করেন।”^৩

আমার মনে হয়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি দেশী-বিদেশী সকল প্রকার প্রযোজক সম্পর্কেই সুপ্রযুক্ত।

তবে প্রযোজক, নির্দেশক, পরিচালক প্রয়োগকর্তা কি আলাদা ব্যক্তি এই নিয়ে প্রশ্নটিই অনেক। যেমন রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ খ্রী: ‘মনমোহন’ থিয়েটারে নাট্যকার শিশির কুমার ভাদুড়ীর ‘সীতা’ নাটকের অভিনয় দেখে, শিশির কুমার ভাদুড়ী বলেছিলেন, তিনি একই সঙ্গে কবি, নাট ও প্রয়োগকর্তা। বাংলা থিয়েটারে প্রয়োগকর্তা শব্দটি বহুদিন থেকেই প্রচলিত। ১৯৪৪ খ্রী: ‘নবান্ন’ অভিনয়ের পর প্রয়োগকর্তার স্থান দখল করেছেন পরিচালক। তখন থেকে নাট্যদল প্রযোজনার অধিকার পেয়েছে আর নাট্য পরিচালকের দেখা মিলেছে। ‘নবান্ন’ অভিনীত হয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় আর বিজন ভট্টাচার্য্য ও শম্ভু মিত্রের যুগ্ম পরিচালনায়। বর্তমানে পরিচালককে বলা হচ্ছে নাট্যনির্দেশক। আর এজন্যই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে নাট্য প্রযোজক ও নাট্যপরিচালক বা নাট্যনির্দেশক কি আলাদা ব্যক্তি? নাট্যাচার্য ভরত আবার নাট্য পরিচালকের কথা বলেননি, বলেছেন নাট্য প্রযোজকের কথা। আমেরিকাতে আবার নাট্য পরিচালকের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে নাট্য প্রযোজকের কথা। আমেরিকাতে আবার নাট্য প্রযোজকের ভূমিকা প্রধান। নাট্যপরিচালক তাঁর অধীনস্থ নাট্যকর্মী। পরিচালকের দায়িত্ব হল অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অভিনয় শিক্ষক রূপে কাজ করা এবং অভিনয়ের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে নজর দেওয়া। আবার ইংরেজী থিয়েটারে পরিচালক ও প্রযোজক সমার্থক। আমাদের দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ে আমেরিকার মত নাট্য প্রযোজকের অধীনে থাকেন নাট্যপরিচালক। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারে নাট্যপ্রযোজক কেউ নেই। সবই করেন নাট্য পরিচালক বা নাট্যনির্দেশক। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখেরা নাট্য নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন, যা পারতপক্ষে নাট্য প্রযোজকের কাজ।

এবার আমরা নির্দেশক শম্ভু মিত্র নিয়ে নিম্নে আলোচনায় অগ্রসর হব—

শম্ভু মিত্র নিজে প্রায় পাঁচশটি নাটক অভিনয়ে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর নির্দেশিত বেশিরভাগ নাটক বহুরূপীর প্রযোজনায় অভিনীত। বহুরূপীর প্রযোজনায় অভিনীত নাটক তাঁকে নির্দেশক হিসাবে খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি নির্দেশক হলেও বহুরূপীতে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রযোজকের ন্যায়। বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে তাঁর নির্দেশনায় বহু নাটক

সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। তাঁর নির্দেশিত নাটক যে সমস্ত নাট্যমঞ্চে সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে সেই সমস্ত নাট্যমঞ্চের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—‘রঙমহল মঞ্চ’, ‘রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট’, ‘নিউ এম্পায়ার’, ‘শ্রীরঙ্গম’, ‘সেন্ট টমাস হল’, ‘সুধাংশু গুপ্তের বাড়ি’, ‘মহাজাতি সদন’, ‘বিশ্বরূপা থিয়েটার’, ‘আইফ্যাকস হল’ (দিল্লী), ‘কলামন্দির’, ‘একাডেমি অফ ফাইন আর্টস’ প্রভৃতি।

শম্ভু মিত্র নির্দেশিত নাটক

<u>নাটক</u>	<u>নাটককার</u>	<u>প্রথম অভিনয়</u>
নবান্ন	বিজন ভট্টাচার্য	১৩/৯/৪৮
পথিক	তুলসী লাহিড়ী	১৬/১০/৪৯
উলুখাগড়া	শ্রীসঞ্জীব (শম্ভু মিত্র)	১২/৮/৫০
ছেঁড়াতার	তুলসী লাহিড়ী	১৭/১২/৫০
বিভাব (একাক্ষ)	বহুরূপীর সদস্যরা	২৯/৪/৫১
চার অধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ	২১/৮/৫১
দশচক্র	ইবসেন, অনুবাদ : শান্তি বসু	১/৬/৫২
স্বপ্ন	ইউজিন ও নিল, অনুবাদ : শম্ভু মিত্র	১৮/৪/৫৩
এই তো দুনিয়া	টেড উইলিস, অনুবাদ : প্রণতি দে	১৮/৪/৫৩
ধর্মঘট	মনমথ রায়	৯/১২/৫৩
রক্তকরবী	রবীন্দ্রনাথ	১০/৫/৫৪
সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে	চেকভ, অনুবাদ : অজিত গাঙ্গুলী	৮/১১/৫৪
পুতুল খেলা	ইবসেন, রূপান্তর : শম্ভু মিত্র	১০/১/৫৮
মুক্তধারা	রবীন্দ্রনাথ	১৫/১২/৫৯
কাঞ্চনরঙ্গ	শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র	২৪/১/৬১
বিসর্জন	রবীন্দ্রনাথ	২৭/১০/৬১

রাজা অয়দিপাউস	সোফোক্লিস, অনুবাদ: শম্ভু মিত্র	১২/৬/৬৪
রাজা	রবীন্দ্রনাথ	১৩/৬/৬৪
বাকি ইতিহাস	বাদল সরকার	৭/৫/৬৭
বর্বর বাঁশী	নীতীশ সেন	৭/৫/৬৯
পাগলা ঘোড়া	বাদল সরকার	২৮/২/৭১
চোপ, আদালত চলছে	বিজয় তেগুলাকর, অনুবাদ : এস. বি.	৯/১২/৭১
	যোশী ও নীতীশ সেন	

বাংলা নাট্যে শম্ভু মিত্রের এক অপর নামই হল এক ‘আন্দোলন’। গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে তিনি চেয়েছিলেন ভিন্ন এক নাট্যভুবন সৃষ্টি করতে। ওই সঙ্গে অভিন্ন থাকতে চেয়েছিলেন ভারতীয় নাট্য সংস্কৃতির সঙ্গে। বাংলা পেশাদারী নাট্যে তিনি কোথাও মঞ্চের সৌন্দর্য্য দেখেছিলেন, কোথায় পেয়েছিলেন অভিনয় কুশলতা। আবার কারো কারো অভিনয়ে পেয়েছিলেন চরিত্রের প্রকাশ নৈপুণ্য। কিন্তু কোনো নাট্যেই এগুলির সমন্বিত রূপ দেখেননি। আর, অধিকাংশ নাট্যেই দেখেছিলেন, ইউরোপীয় নাট্যের নকলবিশিষ্টতা। শম্ভু মিত্রের আকাঙ্ক্ষা জাগল, তিনি ভারতীয় নাট্য আঙ্গিককে সন্ধান করবেন। যা দেখে দর্শক নিজের দেশ, সময়, কালকে বুঝতে পারবে। সেই নাট্যে যেন ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সুখ দুঃখ, আবেগ-ভালোবাসা, সঠিক বাস্তবতায় ধরা দেয়। তাঁর প্রয়োজনার জন্য এমন নাটক নির্বাচন করতে হবে, যার বিষয়বস্তুতে নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে আবেগাতিরেক অনুভূতি থাকবে না, দর্শক সে নাট্যদর্শনে এক বুদ্ধিগ্রাহ্য আবেগানুভূতিতে রসসিক্ত হবে। সেইসব নাটকে নির্মম নিষ্ঠুর চরিত্রও শিল্পশালীন রূপে প্রকাশ পাবে। ভয়ঙ্কর বাস্তব ও দর্শক মনে অবশ্যই ভয়ঙ্কর অনুভূতি জাগাবে, অথচ মঞ্চের উপর ভয়ঙ্কর ঘটনা শিল্প শর্ত মেনেই ঘটবে। এমন নাট্য নির্মাণকল্পে এতদিক সামলানো কত নিপুণ শিল্পবোধের ও কত কঠিন নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়, তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর প্রয়োজনার দিক নির্ণয় করতে তিনি এইসব জ্বলন্ত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হলেন—

“এমনি সহজ হবে, এমনি স্পষ্ট হবে, অথচ এমন বিরাট হবে যা মানুষকে আমূল নড়িয়ে দেবে এ সম্ভব হবে, কী পদ্ধতিতে? ঠিক কেমন করে?”^৪

এবারে শুরু হল তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ—

“বাস্তব আজ চালেঞ্জের মতো সামনে দাঁড়িয়ে বলছে—আমাকে প্রকাশ করো, দেখি তোমার ক্ষমতা।”^৫

এই ক্ষমতা প্রকাশের তাগিদেই ২৯ বছর বয়সের ভরা যৌবনে তিনি ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘে’ যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম প্রমাণ রাখলেন গণনাট্য সংঘের প্রয়োজনায় বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্ম পরিচালনায় ‘নবান্ন’ নাটক পরিচালনার মধ্য দিয়ে শুরু হল নির্দেশক হিসাবে তাঁর পথচলা। এই নাটকের রাধিকার ভূমিকাভিনেত্রী শ্রীমতী সোভা সেন নবান্ন প্রযোজনার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

“আমাদের বলা হল ইনিই (বিজন ভট্টাচার্য) তোমাদের নাট্যগুরু বা শিক্ষক। পার্টি (ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি) বলে দিয়েছেন গুরু তাই নির্দিধায় গুরু বলে মেনে নিয়েছিলাম পরে আরেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি থাকেন চার তলায়, নাম শম্ভুমিত্র। গুরুগম্ভীর-রাশভারী মানুষ। ইনিও শিক্ষক। বিজনবাবু অভিনয়, সংলাপ শেখাবেন, শম্ভুবাবু মঞ্চ, সংগীত ইত্যাদি।”^৬

আবার নবান্নের প্রযোজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুশীল কুমার জানা বলেছেন—

“নবান্নের মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত শম্ভুমিত্র ও শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য যে সাফল্য ও কলা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।”^৭

‘নবান্ন’ অভিনয়কালে নাটকটিকে নানাভাবে সম্পাদিত করা হয়। শ্রদ্ধেয় সুধীপ্রধানের ‘নবান্ন নাটকের প্রযোজনা এবং বাংলা নাটক ও নাট্য আন্দোলনে তার প্রভাব’ নামের প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে কেমন শিল্পসম্মত বাবে নবান্নের দৃশ্য পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

“সম্পাদনার পদ্ধতিগুলি বিচার করলে দেখা যাবে প্রধান সমাদ্দারের পরিবার নিয়ে একটি গল্প আছে এবং সেই পরিবারের পরিণতি আগষ্ট বিপ্লব, কন্যা,

দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর সঙ্গে যেমন হতে পারে যা হয়েছিল তা দেখানো হয়েছে।”^৮

আবার এই প্রবন্ধেই প্রাবন্ধিক সুধীপ্রধান নবান্নের দৃশ্য পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে শম্ভু মিত্রের নাট্য শিক্ষণ কৌশলের প্রশংসা করে জানিয়েছেন—

“দৃশ্যগুলির পরিবর্তনে শম্ভুবাবুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং মঞ্চসজ্জা যতদূর সম্ভব কল্পনার সাহায্যে সরল করার ব্যাপারেও তিনি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কর্তৃক চট ব্যহারের সুপারিশ পেয়েই বাস্তবায়িত করেন। চট দিয়ে তিনটি চেম্বার করা এবং চটের ফালি করে বাঁশের সাহায্যে কখনো কৃষকের বাড়ি, কখনো গণেশের ছবি দিয়ে চালের আড়ত করা, চটের ফালির দরজার দুইপাশে মঙ্গল ঘট, কলা গাছ এবং ফুলের সাজ দিয়ে বিয়েবাড়ি এবং তার পাশে কার্ডবোর্ড দিয়ে ডাষ্টবিন, বাঁশের রেলিং তৈরী করে তার পাশে বেঞ্চি দিয়ে পার্কের আভাষ সৃষ্টি করা প্রভৃতি খুঁটি নাট্য কাজ তিনিই করেছেন। নাটকের সংলাপের কাজ প্রধানত বিজন শেখাতেন। কিন্তু অভিনয়ের কোনো সূক্ষ্ম কাজ করতে হলে মনোরঞ্জনবাবু (ভট্টাচার্য), শম্ভুবাবু, বিজন (ভট্টাচার্য) সকলেই অভিনেতা অভিনেত্রীদের মনে ধারণা জমিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিতেন নিজেদের চেপ্তার উপর। ‘নবান্ন’ অভিনয়ে সফলতার জন্য প্রধানত নিয়মিত রিহর্সলেই দায়ী এবং এ ব্যাপারে শম্ভুবাবু কখনো পরিশ্রান্ত হতেন না। কয়েককোপ চা পেলে তিনি রাত্রি ১২টা পর্যন্ত রিহর্সাল দিতে রাজী হতেন।”^৯

‘নবান্ন’ নাটকে শম্ভু মিত্রের দয়ালের ভূমিকায় অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় শম্ভু মিত্রের অভিনয় সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—

“... গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষক রূপে শম্ভুমিত্র অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। ... শম্ভুমিত্রের অভিনয়ের স্বাভাবিকতা অনবদ্য।”^{১০}

শম্ভু মিত্রের ‘নবান্ন’ পরিচালনায় মৌলিকতা কতটা ছিল এ সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর শম্ভু মিত্র নিজেই দিয়ে দিয়েছেন—

“দ্বিগ্বিজয়ীর তৃতীয় অঙ্কে নাদির শাহ যখন দিল্লীর ধ্বংসের আদেশ দেয় তখন নেপথ্যে বিউগল, ড্রাম ইত্যাদি বেজে উঠতো, বিস্ফোরণের শব্দ হতো মুহূর্মূহ আর তার মধ্যে সৈনিকদের চিৎকার ও আক্রান্তদের আত্ননাদ শোনা যেত। পিছনের পট লাল আলোয় রক্তিম হয়ে যেতো আর পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠত সেই লালের মধ্যে। ... এই নাট্যাভিনয় যদি না দেখতুম তাহলে ‘নবান্ন’র প্রথম দৃশ্যের পরিকল্পনা করা যে সম্ভব হতো না একথা অনস্বীকার্য।”^{১১}

একথায় পরিচালক হিসাবে তিনি যে ‘নবান্ন’ নাট্য প্রযোজনায় শিশির কুমার ভাদুড়ীর কাছে ঋণী তা তিনি দ্বিধাহীন চিন্তে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—এই হল শম্ভু মিত্র। একথায় ‘নবান্ন’ নাট্য প্রযোজনার জন্য শম্ভু মিত্র পরিচালক হিসাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, সফল হয়েছেন, বন্দিত হয়েছেন, প্রশংসা কুড়িয়েছেন। সে নাট্যদর্শনে জনগণ শুধু মুগ্ধ হল না, আবিষ্ট হল না আন্দোলিত হল। তাই তো কুমার রায় লিখেছেন—

“ওঁর কাজের মধ্যে আজ পর্যন্ত যদি কোনো একটা সুর থেকে থাকে, সেটা এই অভিনয়ে সত্য হয়ে ওঠা।”^{১২}

তবে আশ্চর্যের বিষয় হল শম্ভু মিত্র ‘শ্রীরঙ্গমে’ নবান্নের অভিনয়ের পর আর তিনি নবান্নের অভিনয়ের জন্য বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন না। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়া ‘নবান্ন’ অভিনয় করা সম্ভব নয়—এটাই ছিল তাঁর অভিমত। তবে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়া তার পরে গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় ‘নবান্ন’ নাটকের অভিনয় হয়েছে তবে সে নাটকে শম্ভু মিত্র পরিচালনার দায়ভার নেননি। এরপরেই তাঁর ধীরে ধীরে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন আলগা হতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালে ‘কম্যুনিষ্ট পার্টি’ বেআইনি ঘোষিত হবার আগে পর্যন্ত তিনি গণনাট্য সংঘের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছেদ করেননি। গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় শেষ অংশগ্রহণ করে ১৯৪৬ খ্রী: প্রযোজিত

রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ নাটকে। ১৯৪৬ খ্রী: মে মাসে রবীন্দ্র সপ্তাহে কলকাতার ‘টেগোর সোসাইটি’ কর্তৃক নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের যুগ্ম পরিচালক ছিলেন গঙ্গাপদ বসু ও শম্ভু মিত্র। এরপর ‘গণনাট্য সংঘ’-এর প্রয়োজনায় শম্ভু মিত্র আর অংশগ্রহণ করেননি।

গণনাট্য সংঘ থেকে অনেকেই বেরিয়ে এলেন। গণনাট্য সংঘ থেকে সরে আসা নাট্যকর্মীদের নিয়ে গঠিত হল ‘অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়’। এই সম্প্রদায়ের পরিচালক নিযুক্ত হলেন শম্ভু মিত্র। পেশাদারী হিসাবে গড়ে ওঠা এই সম্প্রদায়টি ১৯৪৮ খ্রী: ১৩, ১৪ ও ১৬ই সেপ্টেম্বর ‘রঙমহল মঞ্চ’ অভিনয় করে ‘নবান্ন’ নাটকটির সম্প্রদায়টির আমন্ত্রণ পত্রে মুদ্রিত হত প্রযোজক হিসাবে অশোক মজুমদারের নাম। কিন্তু পরিচালনা, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও অন্যান্য আরো অনেক বিষয়ে দেখাশোনা করতেন শম্ভু মিত্র। শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় ‘নবান্ন’ নাটকটি অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়কে খুব বেশী লাভবান না করতে পারলেও নাট্যদল হিসাবে বেঁচে থাকবার একটি প্রেরণা যুগিয়েছিল। ‘নবান্ন’ নাট্যাভিনয় মঞ্চস্থ করবার পর অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায় শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় তুলসী লাহিড়ীর ‘পথিক’ নাটকটি মঞ্চস্থ করে শ্রীমিত্রের নির্দেশনায় ই.বি.আর. ম্যানসন ইনস্টিটিউটে (অধুনা নেতাজী সুভাষ মঞ্চ)। প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ খ্রী: ১৬ই অক্টোবর। সেই সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শম্ভু মিত্রের নির্দেশনা প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়। ১৯৪৯ খ্রী: ২৮শে অক্টোবর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র প্রয়োজনা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—

“সম্প্রতি শিয়ালদহ রেলওয়ে ম্যানসন হলে শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ীর নবরচিত পথিক নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। মানভূম জেলার একটি কয়লাখনি অঞ্চল কে মাত্র তিনটি দৃশ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহা আধুনিক।”^{১৩}

শম্ভু মিত্র নির্দেশিত এই ‘পথিক’ নাটকটির অভিনয় ও নির্দেশনার প্রশংসা করে তৎকালীন ‘ভারত পত্রিকা’য় ১৯৫৩ খ্রী: ৯ই ডিসেম্বর চিত্র সহ লেখা হয়েছিল—

“এই সম্প্রদায়ের কর্ণধার পরিচালক শঙ্কুমিত্রের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় বাংলাদেশ পেয়েছে শ্রীযুক্ত মিত্র পরিচালিত ‘নবান্ন’ নাটকের মধ্যে। কিন্তু অধিকতর অভিজ্ঞতায় ও প্রতিভার বিকাশে এবং নবীন ও বাংলা খ্যাতনামা কয়েকজন প্রধান শিল্পী সমন্বয়ে অভিনীত ‘পথিক’ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। একটামাত্র দৃশ্যের মধ্যে অতিসাধারণ চট সহযোগে অনাড়ম্বর দৃশ্যসজ্জায় যেভাবে নাটকখানি তিনি উপস্থিত করেছেন তাতে নাটক পরিবেশনার পরিচালনায় তিনি এক নতুন দৃষ্টির পরিচয় দিলেন, একটি মাত্র দৃশ্যে নাটকের সমস্ত ঘটনা সমাবেশ করলেও কোথাও কোথাও একঘেয়েমি সৃষ্টি করে না, এমনি নাটকের গতি চরিত্রগুলোর সজীবতা।

নায়ক অসীম রায়ের ভূমিকায় শঙ্কুমিত্র চরিত্রটিকে শুধু সার্থক করে তোলেননি তাঁর অভিনয় প্রতিভা দর্শক মাত্রেরই শ্রদ্ধার্জন করে। তাঁর নাট্যপ্রতিভা আমাদের মনে এতখানি আশাষিত করেছে যে, এই নবীন শিল্পী বাংলার নাট্যক্ষেত্রের অভিনয়ের যশবৃদ্ধি করতে সমর্থ হবেন।”^{১৪}

‘পথিক’ নাটকটি নির্দেশনার পর শঙ্কু মিত্র সস্ত্রিক মুম্বাই চলে যান। সেখান থেকে ফিরে আসার পর শঙ্কু মিত্র ও আরো অনেকের পরামর্শে ‘অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়’ নাম পরিবর্তন করে হয় ‘বহুরূপী’ ১৯৫০ খ্রী: ১লা মে। ‘অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়’-এর মতই শঙ্কু মিত্র বহুরূপীতেও পরিচালকের পদে আসীন থাকলেন।

‘বহুরূপী’ নাট্যদল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার পর বহুরূপীর প্রযোজনায় শঙ্কু মিত্রের নির্দেশনায় শঙ্কু মিত্রের রচিত উলুখাগড়া নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১২ই আগস্ট ১৯৫০ ই.বি.আর ম্যানসন ইন্সটিটিউটে (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ মঞ্চ)-এ। বহুরূপী প্রযোজিত ও শঙ্কুমিত্র নির্দেশিত এই নাটকের প্রশংসা করে ১৯৫০ খ্রী: ১৫ই সেপ্টেম্বর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় লেখা হয়েছিল—

“দেশের বর্তমান সামাজিক দূরবস্থার পটভূমিকায় ইহার গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্পূর্ণ নতুন ধরণের নাটক খানির মঞ্চসজ্জা করেছিল কোন দৃশ্যই

পুরো দৃশ্যপট নাই-জানালা-দরজা ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের একটা ইঙ্গিত মাত্র আছে। প্রয়োগ কৌশলের অভিনবত্ব সহজেই ধরা পড়ে।”^{১৫}

আরো একটি পত্রিকায় শম্ভু মিত্র নির্দেশিত ‘উলুখাগড়া’ নাটকের প্রয়োগ কৌশলের প্রশংসা করে বলা হয়—

“প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব। একটা দরজা বা একটা জানালা বসিয়ে সেট সাজানোর চেষ্টা একটা গভীর শিল্পবোধের পরিচয় দেয়।”^{১৬}

এই প্রয়োজনা সম্পর্কে স্বপন মজুমদার লিখেছেন—

“উলুখাগড়ায় মঞ্চসজ্জার ইঙ্গিতময় সরলতাও দর্শকদের অভিনবত্বের আশ্বাদ দিয়েছিল। পেছনের পর্দায় কাগজের উপর বড়ো করে একটা জাল আঁকানো হয়েছিল বংশীচন্দ্র গুপ্তকে দিয়ে। একটি পর্দার পাশে একটি জানালা অন্যপাশে একটি দরজা বসিয়ে ঘরের আয়তন এনে দেওয়া হয় মঞ্চে। এই দরজাগুলির মধ্য দিয়ে অভিনেত্রীদের প্রবেশ-প্রস্থান ও নতুন পরিকল্পনা বলে সম্বর্ধিত হয়েছিল দর্শকদের কাছে। সংবাদ সামনিক কাগ্রে তখন থেকেই বহুরূপীর অনুষ্ঠান মাত্রেরই হয়ে উঠল পরিবেশনযোগ্য।”^{১৭}

নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ‘উলুখাগড়া’র প্রয়োজনা ও অভিনয় উভয় ব্যাপারে শম্ভু মিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে লেখেন—

“পরিচালনা ও অভিনয়ে তিনি রসানুভূতির ও রসসঞ্চয়ের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিনোদের প্রগলভতা যেমন লঘু ছন্দে ব্যক্ত করে তিনি মনোরঞ্জন করেছেন, তেমন মর্মাহত বিনোদের মনের গভীরতম স্তরের কঠোর অনুভূতিকেও অভিনয় দ্বারা হৃদয়গ্রাহী করেছেন।”^{১৮}

তবে ১৯৫০ খ্রী: কাটোয়ার ‘অঞ্জলিপত্রিকা’য় ‘পথিক’-এর অভিনয়ের প্রশংসা করা হলেও উলুখাগড়া অভিনয় সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়—

“উলুখাগড়া সম্পর্কে আমাদের মত বিপরীত। গোপন ব্যবসায় বড় বড় শহরের খালি বড়লোকের বাড়ির চিত্র। এরা সমাজের কতটুকু অংশ? এই ক্ষুদ্র অংশের আভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের চিত্র অপরিচিত জনসমক্ষে প্রচারে লোকশিক্ষার পরিবর্তে বিপরীত ফল হইবে’ বলিয়া আমরা আশংকা করি। এই বই প্রচারের যদি কোথাও প্রয়োজন থাকে তবে তাহা বড় বড় শহরেই হওয়া উচিত, যেখানে এই সম্প্রদায় বিদ্যমান।”^{১৯}

‘উলুখাগড়া’ নাটকের অভিনয়ের পর শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়াতার’ নাটক ‘নিউ এম্পায়ার’ মঞ্চে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রী:। বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্র কুমার রায় শম্ভু মিত্রের এই নির্দেশনা সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন—

“সম্প্রদায় (বহুরূপী) দৃশ্যপটকে প্রাধান্য না দিয়ে খুব ভালো কাজ করেছে। চিত্রকল্পের সাহায্য না নিয়েও অভিনয় শ্রেষ্ঠ হতে পারে, এইটে দেখাতে পারাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু আলোচ্য নাট্যানুষ্ঠানের (ছেঁড়াতার) মঞ্চশিল্পী অঙ্গের মধ্যেই যেটুকু কলাকুশলতা প্রকাশ করেছেন তাও প্রশস্তি লাভের যোগ্য। এই নাট্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিল্পীগণ যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে পেয়েছি ভবিষ্যতের আশার ইঙ্গিত।”^{২০}

ছেঁড়াতার নির্দেশনার নাট্যমূল্যায়ণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নাট্যসমালোচক ও তৎকালীন সময়ের বিদ্বান লেখক কমল মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—

“প্রয়োগবিজ্ঞানে বহুরূপী নতুনত্ব এনেছে, মাঝে আমার শত্রুপক্ষ হয়তো বলবে গীতিনাট্য ধরণ, কিন্তু সত্যই দর্শক সাধারণ বলবে এ প্রয়োগ অভিনব। এখানে

নব্য অভিনয় রীতির সঙ্গে দেশাড়েভাবে তথা মাত্রা ইত্যাদির একটি অভিনব সমন্বয় হয়েছে, দুটি রীতি অদ্ভুতভাবে মিশ্রিত হয়েছে বলা যেতে পারে। এর আগে বহু নাটকে কিছু কিছু চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু আমরা পড়েছি, দেখিনি। বহুরূপীর প্রচেষ্টা সার্থক।”^{২১}

স্বয়ং শম্ভু মিত্র ‘ছেঁড়াতার’ নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তির কথা স্বীকার করে একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

“এ-নাটকে তিন অঙ্কে ন’টা দৃশ্য। অর্থাৎ দ্রুত পরিবর্তন প্রয়োজন। অতএব কোনো দৃশ্যই আসবাব পত্র বেশী আনা যায় না। মোটের মাথায় দৃশ্য হচ্ছে গ্রাম্যপথ ও রহিমুদ্দির বাড়ি, আর তিনটি দৃশ্য আছে—যাকে বলি মধ্যবিন্তের বসবার ঘর। দুটি একজন এগ্রিকালচার অফিসারের বসবার ঘর, আর একটি গ্রাম্য জোতদারের ঘর। সাজানো হিসাবে সবচেয়ে মার খেলো এই দৃশ্য গুলি। একটা চটের পর্দার ওপর এক আধটা আসবাব বা জানালা ঐকে দেওয়াই হলো আর তার সামনে দু-একটা চেয়ার বা মোড়া। মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ আমাদের ক্ষমতা হিসাবে এরচেয়ে বেশী মাথায় এলো না। মন দেওয়া হ’ল সাধারণ চাষীদের দৃশ্যগুলির উপর। দূর থেকে দেখলে গ্রামের যে চেহারাটা চোখে পড়ে সেইরকম একটা ছবি আঁকা হলো পিচ্ বোর্ডের ওপর। তা খাড়ায় আড়াই ফুট আর লম্বায় ফুট তিরিশেক। সেইটাকে কাঠের ফ্রেমে স্টেটে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ’লো পিছনের পর্দার একদম গায়ে। যখন সাধারণ গ্রাম্য পথের দৃশ্য তখন মঞ্চের ওপর আর কিছুই থাকছে না। আবার যখন চাষী রহিমুদ্দির বাড়ির দৃশ্য তখন একটা হালকা তক্তপোষের ওপর কুটারের সামনেটা বানানো ছিল সেইটাকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল মঞ্চের উপর। প্রথম অঙ্কের জন্য অপরদিকে একটা কলাগাছ ও একটা ছোট্টো ঝুপড়ি মতনও করা হ’তো। সেগুলো অবশ্য দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দৃশ্যে আর হতো না।”^{২২}

এই মন্তব্য থেকে আমরা শব্দ মিত্রের নির্দেশিত ছেঁড়াতার নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার কথা জানতে পারি।

পরবর্তীকালে বহুরূপীর এই আত্মপ্রত্যয়ী কর্ণধার শব্দ মিত্র ‘ছেঁড়াতার’ নাটকের প্রয়োগ কৌশলের নিপুণতার অভিজ্ঞতা নিয়ে অভিনব নাট্যরীতি উপহার দিলেন ‘বিভাব’ নাটকের প্রয়োজনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে। জাপানী কাবুকী থিয়েটারের অনুসরণে রচিত শব্দ মিত্রের এই নাটকটি শব্দ মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর প্রয়োজনায় মঞ্চস্থ হয় ২৯শে এপ্রিল ১৯৫১ খ্রী: লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত সুধাংশু গুপ্তের বাড়িতে। এই জাপানী কাবুকী থিয়েটারের স্বরূপ বর্ণনা করে রাসেল টেলর জানিয়েছেন—

“The Kabuki dramas are based on popular legends and myth, or sometimes on historical events, they are performed on a wide shallow stage with a sort of cause way running from the left hand side of the stage to the back of the hall along which the actors make their entrance and exits all this being at about the level of the audience hands।”^{২৩}

‘বিভাব’-এর নাট্যকলা সম্পর্কে কুমার রায় লিখেছেন—

“কোনো এক ভদ্রলোক পুরোনো সব নাট্যশাস্ত্র তল্লাস ক’রে আমাদের এই অভিনয়ের নাম দিয়েছেন ‘বিভাব নাটক’। সংস্কৃত হিসাবে তিনি ঠিক কি বেঠিক সে বিবেচনা করছেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা, কিন্তু নামের দিক থেকে আমাদের একটা সামান্য আপত্তি আছে। আমাদের মনে হয় এর নাম হওয়া উচিত ‘অভাব নাটক’। কারণ দূরন্ত অভাব থেকেই এর জন্ম। আমাদের একটা ভালো স্টেজ নেই। সিন-সিনারি আলো ঝালর কিছুই আমাদের নিজের নেই। সঙ্গে থাকবার মধ্যে আছে কেবল নাটক করবার বোকামিটা। তাও যদি বা যোগাড়যন্ত্র ক’রে অভিনয় একটা ফাঁদি সঙ্গে সঙ্গে দেখি সরকারের পেয়াদা

খাজনার খাতা খুলে স্টেজের দরজায় হাজির। তারা পেশাদারের কাছে খাজনা নেননা। কিন্তু আমাদের কাছে নেন কারণ আমরা তো নাটক নিয়ে ব্যবসা করি না। তাই সরকার আমাদের গলা টিপে খাজনা আদায় করে নেন। এবং এই নেওয়াটা এমন বিচিত্র সাঁড়াশি ভঙ্গীতে যে আমরা সর্বস্ব দিয়ে থুয়ে আবার ব্যোমকালী বলে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ি। তাই অনেক ভেবে চিন্তে আমরা একটা পঁ্যাচ বের করেছি যাতে স্টেজ-এর দরকার হবে না—যে কোনও রকম একটা প্ল্যাটফর্ম হলেই চলবে, সিন-সিনারী দরজা জানালা টেবিল বেঞ্চ কিছুরই দরকার হবে না। আমরা অভিনয় করবই।”^{২৪}

আমার মনে হয় ‘বিভাব’ প্রযোজনা সম্পর্কে কুমার রায়ের এই উক্তি বিনীত ভাষণ মাত্র। কেননা আর্থিক সংগঠিত সেভাবে না থাকার জন্য। তৎকালীন সময়ের প্রচলিত মঞ্চভিনয় রীতি থেকে সরে এসে আর্থিক বহুল্য বর্জিতভাবে লোকনাট্যধর্মী নাট্যভিনয় কতটা যুক্তি সংগত। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। শম্ভু মিত্রের নতুন রূপে, নতুন স্টাইলে নাট্য প্রযোজনা উপস্থাপন ‘বিভাব’-এর মধ্য দিয়ে। এই নব নাট্য প্রযোজনার কৌশলকে ব্যক্ত করতে গিয়ে শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন—

“বিভাব প্রযোজনায় যে শুধু আর্থিক সংগতির কথা ভাবা হয়েছিল তাই নয়, এর মধ্যে হয়েছিল দেশজ প্রথার নাট্য প্রযোজনার আঙ্গিক গ্রহণের প্রয়াসও।”^{২৫}

‘বিভাব’ প্রযোজনায় জাপানী ‘কাবুকি’ থিয়েটারের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে ‘মারাঠী’ তামাসার মেলবন্ধনে অর্থাৎ দেশী বিদেশী লোকনাট্যদর্শের মিলন ঘটেছিল।

আনুষ্ঠানকিভাবে বহুরূপীর আত্মপ্রকাশের পর স্থির হয় তাঁরা যে তিনটি নাটকের প্রযোজনা করবে সেই তিনটি নাটক হল—‘উলুখাগড়া’, ‘কাবুলিওয়ালা’ ও ‘ছেঁড়াতার’। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগল্প ‘কাবুলিওয়ালা’। আর সেই ‘কাবুলিওয়ালা’ নাটকটির নাট্যরূপ দানের ভার বহুরূপী কানাই বসুকে দিয়েছিলেন কিন্তু যথা সময়ে নাটকটি তিনি নাট্যরূপ দান

করতে অপারগ হলে বহুরূপী শঙ্কু মিত্রকে রবীন্দ্রনাথের ‘চারঅধ্যায়’ উপন্যাসটি নাট্যরূপ দান করতে অনুরোধ করে। তিনি সেই কাজটি সমাপণ করেন অর্থাৎ বহুরূপী জন্মলগ্ন থেকেই রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে চেয়েছে। আর এই ‘চার অধ্যায়’ নাটকটি নির্দেশনার ভার বহুরূপী শঙ্কু মিত্রের স্কন্ধে তুলে দিয়েছিল। এই নাট্য নির্দেশনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তৃপ্তি মিত্র জানিয়েছেন—

“ ‘পথিক’, ‘উলুখাগড়া’, ‘ছেঁড়াতার’ অনেকদিন ধরে করা হল। আবার প্রয়োজন হল নতুন নাটক করবার। কেবল প্রয়োজনই বা কেন, নিজেদের ভেতরেও ঐ আকাঙ্ক্ষা হতে শুরু করেছিল। শঙ্কুমিত্র মশায় তো ক্ষেপে উঠেছিলেন। কেমন করে জানিনা তাঁর মাথায় এল ‘চার অধ্যায়’ করলে কেমন হয়। আমার সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল। ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাস হলেও কথপোকথনের মাধ্যমেই সমস্ত ঘটনা উদ্ঘাটিত হচ্ছে। অতএব তেমন করে নাট্যরূপ দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে ঐ ভাষা। ... কিন্তু এই ‘চার অধ্যায়’ করা নিয়ে আমাদের এখানে অনেক আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কারণ যখন বইটি লেখা হয়েছিল তখন নাকি এই বইটি সম্পর্কে তখনকার অনেকের অনেক সন্দেহ দ্বিধা ছিল। এই বই নাকি স্বদেশিকতার বিরুদ্ধে। মহর্ষির মনেও একটু দ্বিধা ছিল। ইন্দ্রনাথ চরিত্র যেভাবে এসেছে তাকে কি অশ্রদ্ধার সঙ্গে লেখা বলে চলে? যদিও কোথাও কিছু ভুল থাকে তাকে ভুল বলা যাবে না? রবীন্দ্রনাথ গুঁদের অত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন বলেই না সব জিনিসটা অত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল তাঁর কলমে। আর এমন একটা খাঁটি প্রেমের গল্প? পৃথিবীতে কটা লেখা হয়েছে জানিনা। বেশ কয়েকদিন আলোচনা চলেছিল— মহর্ষির মনের দ্বিধা কেটে গিয়েছিল। শঙ্কুমিত্র তাঁর দৃষ্টিকোণটি মহর্ষিকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন।”^{২৬}

‘চারঅধ্যায়’ অভিনয় মঞ্চস্থ করানো নিয়ে ‘বহুরূপী থিয়েটার’-এ সদস্যদের মধ্যে নানারূপ বিতর্ক

ছিল। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় ও ‘চার অধ্যায়’ মঞ্চস্থ করা নিয়ে বেশ দ্বিধাযুক্ত ছিলেন। কিন্তু শম্ভু মিত্রের বিশেষ অনুরোধে তিনি মনোযোগ সহকারে ‘চার অধ্যায়’ পাঠ করে শম্ভু মিত্রকে নাটকটির নাট্যরূপ করার বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। তখনই শম্ভু মিত্র নাটকটির নাট্যরূপ দান করেছিলেন। স্বয়ং শম্ভু মিত্র এ বিষয়ে তাঁর মানসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—

“... ‘চারঅধ্যায়’কে নাটকায়িত করার সময়ে যখন একে কেটে ছেঁটে সাজানো হচ্ছিল তখনি এর চিন্তাধারাটা, এর অনুভবের ধারাটা জীবন্ত হয়ে বোধের মধ্যে আসছিল। ফিল্মে যেমন গল্পটা সিনারি ও শ্যুটিং স্ক্রিপ্টে বাঁধতে হয়, মঞ্চাভিনয়েও ঠিক তাই করতে হয়। এমনকি লিখিত নাটকের ক্ষেত্রেও।”^{২৭}

ড. জগন্নাথ ঘোষ মহাশয় এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন—

“চারঅধ্যায়ের অভিনয়পত্রীতে রবীন্দ্রবাণী উদ্ধৃত হয়েছে। চারঅধ্যায় উপন্যাস থেকে—‘স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল।’ রবীন্দ্র উক্তিই ধরা পড়ে উক্ত জীবন্তবোধের উল্লেখ। শম্ভুমিত্র কেন বিতর্কিত ‘চারঅধ্যায়ের’ নাট্যরূপ দিতে উদ্যত হন তার ব্যাখ্যা মিলবে এখানে। উপন্যাসটি রচনার ১৭ বছর বাদে বলা যায় যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব হল শম্ভুমিত্রের প্রয়োজনায়।”^{২৮}

নাটকটি বছরপূর্ণ প্রয়োজনায় শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় ‘শ্রীরঙ্গমমঞ্চ’ প্রথম অভিনীত হয়েছিল ২১শে আগস্ট ১৯৫১ খ্রী:। নির্দেশনার দায়িত্ব ছাড়াও শম্ভু মিত্র এই নাটকে অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথমদিকে ইন্দ্রনাথ চরিত্রে পরে অতীন চরিত্রে। ‘সত্যযুগ পত্রিকা’য় এই নাট্য প্রয়োজনা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—

“চারঅধ্যায় মূলত নাটক নয় উপন্যাস। উপন্যাসের মধ্য থেকে যথার্থ নাটকীয় উপাদানকে ছেঁকে তোলা শিল্পীর কৃতিকর্ম। এ পরীক্ষায় বছরপূর্ণ জলপানি না

পেলেও। ফার্স্ট ডিভিশনের নম্বর নিয়ে পাশ করেছেন। যে জিনিসটা প্রথমেই চোখে পড়েছে তা হল নাটকের প্রয়োগ কৌশলের বিশিষ্টতা। সূত্রধর গল্প শুরু করল। সেই গল্প মোড় নিয়ে নাটকের মোহনায় প্রবেশ করল, নাটক শুরুর সংস্কৃত ঘেঁষা এই পদ্ধতিটি নতুনত্বের স্বাদ এনেছে নিঃসন্দেহেই তবে সূত্রধরের বাচনভঙ্গী যদি শঙ্কুমিত্রের হতো তবে শেষ পর্যন্ত আলুনি হয়ে পড়তো না বোধ হয়। গল্পটা এলা ও ইন্দ্রনাথের নেপথ্য অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যেভাবে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছে তারজন্য পরিচালকের উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসাই করতে হয়। এই নাটকটি সাধারণকে যদি তৃপ্তি দিতে নাও পেরে থাকে সংলাপশ্রয়ী নাটক শুনতে সাধারণ দর্শক অভ্যস্ত নয় বলেই এই আশঙ্কা। তবু যাঁরা নাট্যমোদী বিশেষ করে যারা নাটক অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত তাঁরা নাটকের প্রয়োগ ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান পাবেন। ‘চার অধ্যায়’ তারই ইঙ্গিত তময় নতুন এক অধ্যায় তুলে ধরেছে।”^{২৯}

‘চার অধ্যায়’ প্রযোজনা থেকে শঙ্কু মিত্রের নাট্য নির্দেশনা কৌশলের যে কয়েকটি কৌশলের কথা আমরা জানতে পারি তা জগন্নাথ ঘোষের কথায় বলা যায়—

“প্রথমত: চার অধ্যায় শুরু হয়েছে ‘বিভাব’ নাটকের আরম্ভের নাট্য সংঘটন দিয়ে। অর্থাৎ সূত্রধরের অভিনয় দিয়ে। এটাকে বলা হয়েছে ‘সংস্কৃত ঘেঁষা’ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির প্রয়োগ বাংলা মঞ্চে এক অভিনব নাট্য সম্ভবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এছাড়া নাটকের আবহ সৃষ্টিও এক নিদারুণ নাট্য কৌশল সৃষ্টি করেছে। আগ্নেয়াস্ত্র ছোঁড়ার শব্দ দিয়ে যে আবহ আবহ তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছিল, তাতে স্পষ্ট হয়েছিল যে নাটকটির পটভূমিতে রয়েছে সন্ত্রাসবাদ। সংলাপের ভাষা প্রয়োগে রয়েছে রবীন্দ্র ভাবনার উজ্জ্বল উপস্থিতি।”^{৩০}

‘চার অধ্যায়’ নাটক নাট্যরূপের ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শঙ্কু মিত্র জানিয়েছেন—

“তখন রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা সম্পর্কে কুসংস্কার এড়িয়ে বুঝতে শিখেছি যে প্রত্যেক বড় লেখকের লেখা পড়তে গেলে মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বাকছন্দটা ধরবার চেষ্টা করতে হয়। নইলে কিছুতেই তাকে বোঝা যায় না। ... এবং ‘চারঅধ্যায়ে’ পৌঁছবার আগেই আমরা এটা তো বুঝতে পেরেছি যে রবীন্দ্রনাথ লোকটি আমাদের মতো লোকের চেয়ে অন্তত হাজার গুণ বেশি বুদ্ধিমান। সুতরাং সংলাপের সেই ধারালো বুদ্ধিটা যদি না বোঝাতে পারি লোককে, যদি সেই সংলাপ বুদ্ধিবর্জিত ‘কাব্যিক’ কাব্যিক সুরে পড়ি তাহলে নিজেদের যতটুকুও বুদ্ধি আছে তারও অপমান ঘটাই।”^{৩১}

জগন্নাথ ঘোষ মহাশয় আরো জানিয়েছেন যে—

“ ‘চারঅধ্যায়’ মঞ্চস্থ হবার আগে পর্যন্ত জানা যায়নি, এটি নাট্যরূপ দেওয়া সম্ভব। শম্ভুমিত্র এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছেন। মঞ্চ পরিকল্পনা, আবহ সৃষ্টি এবং সংলাপ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেই অসম্ভবের শিল্পরূপ স্পষ্ট হয়েছে।”^{৩২}

‘বিহার হেরাল্ড’ পত্রিকায় ১২ই জানুয়ারী ১৯৫২ খ্রি: ‘চার অধ্যায়’ নাটকের প্রযোজনা কৌশলের প্রশংসা করে লেখা হয়—

“The subtle conflict brought out more by Tagore’s inimitable dialogues than through concrete action would not when staged permit its easy apprehension by the majority of audience and so stippled in the producer (Mr. Sambhu Mitra) with his new psychological technique and actors with their rare gifts of expression to lift the audience to the lure Tagore’s spirit.”^{৩৩}

‘চার অধ্যায়’ নাটকের মঞ্চ ও প্রয়োগ সাফল্য শম্ভু মিত্রকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তুলেছিল।

আর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে সাহস যুগিয়েছিল ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনায়। এই প্রযোজনা আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে পৌঁছেছে। শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্যজীবনের বিভিন্ন পর্বে ‘রক্তকরবী’ সম্পর্কে যতকথা বলেছেন এবং লিখেছেন, সেরকম আর কোনো নাটক নিয়ে তিনি বলেননি বা লেখেননি। বিশেষ করে ‘রক্তকরবী প্রসঙ্গে’ নামক নিবন্ধে তিনি অনেক কথা জানিয়েছেন। তিনি সেখানে জানিয়েছেন, কিভাবে কার কাছে থেকে তিনি মঞ্চসজ্জা, আবহসঙ্গীত রচনা, সংলাপ সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন। এ ব্যাপারেও তাঁর প্রধান মন্ত্রদাতা ছিলেন খালেদ চৌধুরী। এই রক্তকরবী প্রযোজনা প্রসঙ্গে খালেদ চৌধুরী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন—

“তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী ‘বহুরূপী’তে এলেন এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা। আঁকতে পারেন, যে কোনও বাজনা বাজাতে পারবেন, গান শেখাতে পারেন, আর যতো নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় রক্তকরবীর চিন্তা পেয়ে বসল।”^{৩৪}

শম্ভু মিত্রের বলা এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি খালেদ চৌধুরীর সহযোগীতা তাঁকে ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। সেই সঙ্গে অবশ্যই মিশে ছিল তাঁর গভীর নাট্যবোধ। এই নাট্যবোধের স্বরূপ তিনি নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর লেখায়—

“‘চারঅধ্যায়’ অভিনয়ে প্রথম ও শেষ অধ্যায়ের শেষে একটু সুরের দরকার ছিল যার শীর্ষবিন্দুতে ‘বন্দেমাতরম্’ কথাটি জিগির দেওয়ার মত আসবে। সে সুর রচনা করেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, এছাড়া আবহ সৃষ্টি করার জন্য কখনো বাড়ের শব্দ, কখনো কুকুরে ডাক, কখনো গীর্জার ঘড়ির আওয়াজ ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু রক্তকরবী প্রযোজনার সময় মনে হলো এখানে সুরের প্রয়োজন অনেক বেশী, অথচ চিরাচরিত যে পণে আবহ সঙ্গীতের সুরারোপ করা হয়ে থাকে সে পদ্ধতি এ নাট্যে খাপ খাবে না। অর্থাৎ কেবল কারখানা বা খনির বাস্তব আওয়াজে যেমন এর কাব্যকে ধরা যাবে না, তেমনি

সাধারণ নিয়মের আবহ সঙ্গীতে এর বাস্তবরূপটি হারিয়ে যাবে। তাই দরকার ছিলো এক মৌলিক দৃষ্টিঙ্গির, এক অনন্য বোধশক্তির যার মধ্যে সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় গভীরভাবে অনুভূত।”^{৩৫}

‘রক্তকরবী’ নাট্যরূপ দেবার আগে শঙ্কু মিত্র রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটকটি বারবার পাঠ করেছেন। সেকথা তিনি ‘নাটক রক্তকরবী’ শুরুতে লেখকের নিবেদন অংশে জানিয়েছেন—

“১৯৪৬ সালে ‘রক্তকরবী’ নাট্য প্রস্তুত করার সময়ে আমরা ‘রক্তকরবী’ নাটকটি যেভাবে পড়েছি এবং পরে অভিনয় করতে করতে এর মধ্যে আরো যত মানে খুঁজে পেয়েছি তারই কিছু বিবরণ এই লেখার মধ্যে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি।”^{৩৬}

রক্তকরবী নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোপাল হালদার লিখেছেন—

“শ্রীযুক্ত শঙ্কুমিত্র যা করতে চেয়েছেন তা অনুকরণ না, রবীন্দ্রনাথের নকল নয়, রবীন্দ্রানুপ্রেরণায় নতুন সৃষ্টি। ...রক্তকরবীকে কবি প্রাণদান করেছেন, কিন্তু ‘রক্তকরবী’ জীবন্ত হয়ে উঠেছে শঙ্কুমিত্রের প্রযোজনায়।”^{৩৭}

‘রক্তকরবী’ নাট্যের রূপায়ণ সম্পর্কে শাঁওলী মিত্রের কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হল—

“রক্তকরবী নাট্যের রূপায়ণ সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য:

সম্পাদনাকে তুলে ধরাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে মঞ্চসজ্জা ও প্রযোজনার কিছু বিবরণ দিলে আগামী প্রজন্মের কল্পনা করবার সুবিধা হবে, যে এই প্রযোজনাটি কেমন করে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষার্থীর হয়তো কৌতূহল হতে পারে। তাই এই প্রয়াস। এ-নাটকে বাদ দেওয়া হয়েছিল খুবই সামান্য অংশ। মূল নাটকটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে সহজেই তা বোঝা যাবে। আপাতত আমরা কল্পনা করি মঞ্চসজ্জা। মঞ্চের বর্ণনা এইরকম—

১. মঞ্চের তথা অভিনেতার ডানদিকে রাজার দরজা। যেন জালের

আবরণ। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির আদলে তৈরি। গাঢ় সবুজের ওপর নানান রঙের আঁকিবুকি। ফাঁকে একটু ছোট্ট নেট লাগানো জানালা। দরজার মাথার দু'পাশে লাল আলো জ্বলে রাজার উপস্থিতিতে। লাল দু'টো চোখের মতন। তার মাঝখানে একটা বাজপাখির চেহারা—শক্তির প্রতীক। দরজায় সোনালি ভারী কড়া আছে। দরজার মাঝখানে। দরজার পায়ের কাছে নীচে শ্বেতপাথরের দুটি ধাপ মঞ্চতলকে ছুঁয়েছে। দরজাটি প্রথম এবং দ্বিতীয় উইং ঢেকে কোণাকুণি বসানো।

২. দরজা থেকে একটু মঞ্চের পিছন দিকে গেলে একটি ছাইরঙা উঁচু দেয়ালের গায়ে একটি ধ্বজদণ্ড। রাজার আবাসনের সবটাই যেন শক্ত দেয়াল ঘেরা। ধ্বজদণ্ডটি যেখানে বসানো তার নীচে একটি কালোমূর্তি, সে যেন ধ্বজদণ্ডটি মাথায় করে রেখেছে। কেতনের রঙ হালকা নীল। মধ্যমঞ্চের অভিনেতার দিক থেকে ডান হাতে এটি স্থাপিত।
৩. আরো একটু পিছনে গেলে পর্দার লাইনের সমান্তরাল একটি গলিপথ আছে। ওপরে-নীচে দাঁত দাঁত। 'মকর-মুখ'। তার পিছন দিয়ে যেন রাস্তা চলে গেছে। আমাদের মনে পড়বে সংলাপে 'মকর', 'মকরের দাঁত' এবং 'মকরমুখ'-এর উল্লেখ আছে একাধিক বার।
৪. অভিনেতার বাঁদিকে দু'দিক থেকে কালো পাথরের তিনটি করে সিঁড়ি (একটি সামনে দর্শকের দিক থেকে এবং দ্বিতীয়টি মধ্যমঞ্চের দিক থেকে উঠে) একটা শ্বেতপাথরের চাতাল তৈরি করেছে। সিঁড়ির ধাপগুলো ৯ ইঞ্চি উঁচু। তার মানে মঞ্চতল থেকে ২ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচুতে এই চাতাল। সেই চাতাল থেকে আবার শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, অপেক্ষাকৃত সরু, উঠে অভিনেতার বাঁ দিক ঘেঁষে দ্বিতীয় একটি আরো উঁচু চাতাল তৈরি করেছে। সম্ভবত তার উচ্চতা ৫ ফুটের কিছ বেশি।

দু’দিকে শ্বেতপাথরের থাম। তারপর যেন শ্বেতপাথরের রাজপথ বিস্তৃত হয়ে চলে গেছে ভিতরে অর্থাৎ মঞ্চের বাইরে। কেবল উচ্চপদস্থ লোকজনই ওই রাজপথ দিয়ে যাওয়া-আসা করে। শ্রমিকদল থাকে মঞ্চতলেই। ওই দিকেই মঞ্চতলে, থামের পিছন দিয়েও বাঁদিকে নিষ্ক্রমণের পথ ছিল।

৫. পিছনে আকাশি পট।

স্মর্তব্য—১৯৫৪ সালে এই মঞ্চভাবনা খুবই নতুন ছিল। মঞ্চে এতগুলো স্তরের ব্যবহার তখন পর্যন্ত কল্পনা করা যেত না। এই মঞ্চসজ্জার সরাসরি উইং-এর ব্যবহার কমিয়ে কমপক্ষে ছ’টি ঢোকবার-বেরুবার পথ বার করা হয়েছিল। সামনের মঞ্চের দু’দিকে দুটি উইং ব্যবহৃত হত, যাকে আমরা গেট-উইং বলে থাকি। মঞ্চের পিছনে দু’টি পথের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম পথটি ছিল সিঁড়ির ওপরের রাজপথ। ষষ্ঠ পথটি ওই মকরমুখের গলিপথ, যেখান থেকে ছিটকে পড়ত রাজার ‘এঁটো’রা।

রক্তকরবী-র মঞ্চসংক্রান্ত এবং আবহ-রচনা নিয়েও দুটি প্রবন্ধ আছে শম্ভু মিত্র-র। রক্তকরবী নাটকটি নিয়ে ‘নাটক রক্তকরবী’ তাঁর শেষ জীবনের অতি মূল্যবান রচনা। এ ছাড়াও রক্তকরবী সম্পর্কিত প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। সম্প্রতি প্রকাশিত ‘এক বক্তার বৈঠক’ পুস্তকেও ‘রক্তকরবী’ নিয়ে তাঁর অনেক বলা-না-বলা কথা আমরা জানতে পেরেছি। বিশেষত মার্বেল পাথরের অনুব কী করে মঞ্চে আনা হয়েছিল তার বিবরণ নাট্যকর্মীদের পক্ষে অত্যন্ত আগ্রহের বস্তু।

প্রয়োজনা বিবরণ:

অভিনয়ের জন্য কিছু ধ্বনি ব্যবহৃত হত বা টুকরো শব্দ—যা কথোপকথনের ভঙ্গিকে সচল করত। সেই আভাসটুকু দেওয়ার জন্য

বন্ধনীর মধ্যে সেই বিবরণ গ্রথিত হল। সেই সঙ্গে আবহ-র আভাস। অভিনয়ে সংলাপ উচ্চারণে সচলতা তথা সমসাময়িক ভঙ্গি আনবার জন্যে যে টুকরো কিছু শব্দ ও শব্দ-বন্ধ উচ্চারিত হত তা দেওয়া রইল বন্ধনীর মধ্যে।

পর্দা খুললে দেখা যেত, উজ্জ্বল আলোতে বাঁ-দিকের চাতালের ওপরে নন্দিনী মালা গাঁথছে,—কুন্দফুলের। পদ্মপাতায় আরো কিছু ফুল। দূর থেকে লোহালকড়ের ঠোকাঠুকিতেই এক সাংগীতিক আবহ তৈরি হত। সেই সঙ্গে পাখির ডাক বাঁশির সুরে ধ্বনিত। তারই মধ্যে দিয়ে দূর থেকে কিশোরে ডাক ভেসে আসত—‘নন্দি-নী!—নন্দিনী—! নন্দিনী, নন্দিনী—’ ডাকতে ডাকতে দৌড়ে সে পৌঁছে যেত নন্দিনীর কাছে। এক হাতে সাজি ভরা ফুল সে নন্দিনীর হাতে তুলে দিত! আর অপর হাত তার পিছনে, লুকিয়ে রেখেছে নন্দিনীর প্রিয় রক্তকরবী ফুল। সেই ডাকের উত্তরে নন্দিনী হাসিমুখে বলে উঠত, ...।”^{৩৮}

বার্নার্ড শ তাঁর নাটকগুলিকে মঞ্চায়নের সুবিধার্থে মঞ্চকৌশল, আলোকপাতের কৌশল, বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করতেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তা করেননি। স্বাভাবিক ভাবেই তা প্রয়োজনা করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। সেকথা শম্ভু মিত্রও জানতেন। তবুও তিনি তা সুন্দরভাবে প্রয়োজনা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকেও সুন্দরভাবে মঞ্চস্থ করা যেতে পারে। আমরা জানি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকটি মুদ্রিত করার আগেই সেটি মঞ্চস্থ করার জন্য নাট্যচার্য শিশির কুমারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কেননা হয়তো তিনি একথা মনে মনে বিশ্বাস করেছিলেন যে তা প্রয়োজনা করা একমাত্র শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয় তা মঞ্চস্থ করতে পারেনি। বলা হয়ে থাকে যে শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয় নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করার মতো যোগ্য অভিনেত্রীর অভাবে তা মঞ্চস্থ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। হয়তো বা শুধু এটিই একমাত্র কারণ নয় আগে অনেক কারণেই তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পারেননি। যাই হোক এ বিষয়ে দেবকুমার বসু ও রবি মিত্র রচিত ‘শিশির সান্নিধ্যে’ গ্রন্থখানি

পাঠ করলে আমরা এ বিষয়ে কিছু কথা জানতে পারব। শিশির কুমার ভাদুড়ী নাকি বলেছিলেন—

“ ‘রক্তকরবী’ একসঙ্গে সবটা না পড়লে অসুবিধে হয়। তাই বইটার মধ্যে একগাদা idea আছে, বলতে চেয়েছিলেন মাঠে চাষ করে ফসল ফলানো, পাঁচিল তুলে মাটি খুঁড়ে তাল তাল সোনা তোলার চেয়ে অনেক ভালো। বইয়ের শেষ কথা হল, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে। কিন্তু লিখতে গিয়ে বুরোফ্রেন্সিস ওপর ওঁর যে সব ক্ষোভ ছিল তা পিলপিল করে ঢুকে পড়ল।”^{৩৯}

এই কথা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হয়তো বা নাট্যচার্য শিশির কুমারের মনে দ্বিধা ছিল—নাটকটির মধ্যে হয়তো বা নাট্যরসের ঘাটতি আছে। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও রক্তকরবী নাটকটি মঞ্চস্থ করেননি। কিন্তু যেদিন তিনি শুনলেন শম্ভু মিত্র রক্তকরবী নাটকটির প্রযোজনা করবেন সেদিন তিনি নাটকটির প্রযোজনা সম্পর্কে বেশ সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তথাপি শম্ভু মিত্রকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন—

“Go ahead!”^{৪০}

যাই হোক শিশির কুমার ভাদুড়ীর শুভেচ্ছাবাণী মাথায় করে এবং ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনার পূর্বে তিনি সে সমস্ত নাটকে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন, তার সাফল্যও বৈফল্যকে সঙ্গী করে তিনি ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনায় হাত দিয়েছিলেন এবং অসম্ভব রকম সাফল্যতাও পেয়েছিলেন। তিনি যদি আর কোন নাটকে প্রযোজনা নাও করতেন তবুও মঞ্চপ্রিয় মানুষ, নাটক পাগল দর্শক সারাজীবন তাঁকে মনের মণিকোঠায় শ্রেষ্ঠ স্থানে আসীন রাখত। তাঁর এই প্রযোজনায় তাঁকে খালেদ চৌধুরী সর্বৈব সাহায্য করেছিল। সে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। নাটকটির প্রথম প্রযোজনায় যে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তা নিম্নে তুলে ধরা হল—

“অভিনেতৃবর্গ

নন্দিনী	: তৃপ্তি মিত্র
কিশোর	: পরেশ ঘোষ / প্রজ্ঞা মৈত্র / হিমাংশু চ্যাটার্জি / রমাপ্রসাদ বণিক
অধ্যাপক	: গঙ্গাপদ বসু / দেবতোষ ঘোষ
গোকুল	: বেণীমাধব মুখার্জি / কমল ভট্টাচার্য / বলাই গুপ্ত / সুনীল সরকার / তারা পদ মুখার্জি
রাজা	: শম্ভু মিত্র
ফাগুলাল	: মোহাম্মদ জাকারিয়া / শান্তি দাস
চন্দ্রা	: আরতি মৈত্র / লতিকা বসু / রমলা রায়
বিশু	: শোভেন মজুমদার
সর্দার	: অমর গাঙ্গুলি / কালীপ্রসাদ ঘোষ
গোঁসাই	: নির্মল চ্যাটার্জি / কুমার রায়
মোড়ল	: পুলিন বসু / সমীর চক্রবর্তী
ছোটসর্দার	: সমীর চক্রবর্তী / কালীপ্রসাদ ঘোষ / শঙ্করপ্রসাদ ঘোষ
পুরাণবাগীশ	: সন্তোষ ব্যানার্জি / গুরুদাস মুখার্জি / মুকুন্দ দাস
গজ্জু	: সীতাংশু মুখার্জি / নির্মল চ্যাটার্জি / বলাই গুপ্ত
চিকিৎসক	: অনিল ব্যানার্জি / দেবতোষ ঘোষ / অরিজিৎ গুহ
৩২১ মোড়ল	: অমর পাঠক / বিরিঞ্চি যশ / অনিল ব্যানার্জি
মেজর সর্দার	: নির্মল চ্যাটার্জি / উদয় সিংহ / বিশ্বনাথ মিত্র।” ^{৪১}

রক্তকরবীতে আবহ সৃষ্টিতে খালেদ চৌধুরী কখনও চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করেননি। তিনি প্রয়োজন বোধে নতুন বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। শম্ভু মিত্র এই নব উদ্ভাসিত বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট করেই প্রণিধান যোগ্য ভাষায় লিখেছেন—

“নাট্যের শুরু একা নন্দিনীকে নিয়ে। সে মঞ্চের উপর একটা চবুতরায় বসে

ফুলের মালা গাঁথছে। এইখানে একটা কিছুর দরকার হলো যে, এই লক্ষ্যপূরীতে সুরকে খণ্ডিত করে বেসুরের প্রতাপ। খালেদ চৌধুরীর টিউনিক ফর্ক নিয়ে বেরুলেন পুরানো লোহালঙ্কারের দোকানে খোঁজ করতে। যোগাড় করলেন গোটাকতক ভাঙা লোহার পাত। যেগুলো আলাদা পর্দায় বাজবে। সেই বাজানোর ছন্দে মাঝে মাঝে নাকাড়ার উপর ঝাঁটা মেরে, কাঠের টুকরোর উপর কাঠি মেরে, একসঙ্গে একটা যন্ত্রের আওয়াজ তৈরী হলো। তারপর সেই বাজনাটা মেলানো হলো বাঁশীর সঙ্গে। বাঁশীর আওয়াজ মানুষের জীবনের উৎসারিত সুরের মতো, আর অপর আওয়াজ গুলো যেন যান্ত্রিক জীবনের বেসুরত্ব। সে কেবলি বাঁশীর আওয়াজকে ছাঁপিয়ে উঠতে চায়।”^{৪২}

এ বিষয়ে বলতে গিয়ে জগন্নাথ ঘোষ মহাশয় জানিয়েছেন—

“রক্তকরবী’র প্রযোজনায় শঙ্কুমিত্রের অনুভবের ভিত্তি ও খালেদ চৌধুরীর অনুভবের ভিত্তি একবিন্দুতে মিলে গিয়েছিল।”^{৪৩}

শুধু সঙ্গীতের ব্যাপারেই নয়। ‘রক্তকরবী’র সেট তৈরীতে খালেদ চৌধুরীর সাহায্য পেয়েছেন শঙ্কু মিত্র। খালেদ চৌধুরী তাঁর ‘শিল্পের শর্ত’ প্রবন্ধে (‘যোগসূত্র’-অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২) ‘রক্তকরবী’র সেট তৈরীর বিষয়ে লিখেছেন—

“সাহিত্যের নাটকটা কীভাবে জ্যান্ত নাটক হয়ে ওঠে সেবোধ আমার একেবারেই ছিল না। শঙ্কুমিত্র একদিন কাগজের মডেল বানিয়ে বললেন— ‘এটা রাজার ঘর, এটা অমুক ইত্যাদি’। আমি ভাবছি এতবড় একটা স্টেজ রয়েছে এতটা স্পেস রয়েছে তাতে ফ্রি ডায়মেনশনাল একটা জায়গা পাচ্ছি। কী দিয়ে তাকে ভরাট করব? রাজার ঘরই বা কেমন হবে? আস্তে আস্তে নাটকের ভিতরে তাকাবার চেষ্টা করলাম। শঙ্কুমিত্র আমাকে নানা জিনিস বুঝিয়ে সাহায্য করেছেন। যেমন প্রথমে ‘মকর মুখ’ জিনিসটা ঠিক কী বুঝতাম না। পরে যখন ‘রাজার এঁটো’র তাৎপর্য ধরতে পারলাম তখন ‘মকর মুখ’

একটা আর্কিটেকচারাল চেহারা নিয়ে এলাম ... একটা জায়গা আছে বিশু পাগল বলেছে : আয়রে ভাই লড়াইয়ে চল। সে উঁচুতে উঠে চিৎকার করে আর তার চারপাশে সবাই জড় হয়। আমার পিরামিডের চেহারাটা মনে হল। মনুমেন্টাল একটা আকারে কম্পোজিশনটা গড়া হল। রাজার ঘরের সামনে যে জাল ছিল, প্রথমে যেটা গগন ঠাকুরের আঁকা ‘রক্তকরবী’ বইয়ের থেকে ছবছ অনুকরণ করে তৈরী করা হয়। পরে সেটা সম্পূর্ণ বদলে দিলাম। পরে দরজটা উপরে নিচে হাঁ হয়ে খুলে যেত আর মকর মুখের চেহারা স্পষ্ট বেরিয়ে আসত। ‘রক্তকরবী’তে সে সমস্ত এলিমেন্টস আছে রাজা বা নন্দিনী যে সমস্ত কথা বার্তাগুলো বলে ওই সমস্ত কিছু ওই দরজার কম্পোজিশনে ধরা আছে। সুপার ইমপোর্জ করা হয়েছে। চট করে দেখলে মনে হবে গগন ঠাকুরের ছবি, আসলে কিন্তু তা নয়।”^{৪৪}

একথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, খালেদ চৌধুরীর মৌলিক ভাবনা চিন্তা শব্দ মিত্রের প্রয়োগ ভাবনাকে সার্থক করে তুলতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছিল। আর তারই ফলে শব্দ মিত্রের ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনা শিল্প সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছিল এবং দর্শকদের মন জয় করে নিতে পেরেছিল এবং নাট্য প্রযোজনাটি হয়ে উঠেছিল অনবদ্য, অভিনব ও অনন্য।

‘রক্তকরবী’ প্রযোজনায় খালেদ চৌধুরীর পাশাপাশি আর একটি মানুষ প্রযোজনা সুন্দর ও শিল্পসার্থক করে তুলতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন। তিনি হলেন তাপস সেন। তাঁর আলোক সম্পাতের কৌশল ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনায় নতুনমাত্রা যোগ করেছিল। ‘রক্তকরবী’তে আলোর শিল্পিত ও প্রয়োগের স্মৃতিচারণা করেছেন তিনি ‘সায়ক’ নাট্যপত্রে (নভেম্বর ১৯৯৪ খ্রী:)—

“ ‘রক্তকরবী’ নাটকে বিশু নন্দিনী রাজার ঘরের সামনে বসে নিভুতে তাদের কথাবার্তা বলছে—তার আগে কড়া রোদে ‘পোষ তোদের ডাক দিয়েছে—’ খালেদ চৌধুরীর সেই চাতাল ঐশ্বর্যের প্রতীক সীদা পাথর কালোপাথর

অনেকগুলো ধাপ আর একদিকে রাজার ঘর। রাজার ঘরের সামনে জাল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুকরণে বা খালেদ চৌধুরী একটা রাজার দরজা করেছেন। আর রাজা যখন কথা বলেন তিনি নেপথ্যেরই লোক। ‘রক্তকরবী’ নাটকেই আছে। কিন্তু শম্ভুবাবু ভাবলেন রাজা যখন কথা বলবেন তখন দুটো লাল আলো জ্বলে উঠবে রাজার উপস্থিতির পরিচয় হিসেবে। ঠিক রাজার অংশ শেষ হয়ে গেলে নিভে যায়। কয়েকটা অভিনয় হয়ে যাবার পর আমি একদিন শম্ভুদাকে বললাম যে ঐ দুটো আলোতে লেন্স লাগিয়ে দিলে তো হয়। উনি বললেন কি হবে? বললাম ভাঁটার মত দেখাবে। শুধু আলো জ্বলছে পিরিক করে। লাল সিলোফোনে চোকো না গোল বোধ হয় ছিল। আমি ৬ ইঞ্চির আলোর লেন্স লাগিয়ে দিলাম। ঐ সামান্য আলো ভাঁটার মতো জ্বলে উঠলো। সব জায়গা থেকে দেখা যায়। বেশ ভালো হল। এই রকম দুটো লেন্স লাগিয়ে অনেকটা ডাইমেনশান এসে গেল। শম্ভুদা একটা কথা প্রায়ই বলতেন যে একটা দৃশ্য থেকে আর একটা দৃশ্য সারে প্টিসিয়াসলি যাবে ইম্পারস্টিভলি যাবে—দর্শক খেয়াল করবে না। এইটে আমার কাছে বড় দুরূহ ব্যাপার হল—এই লাইনগুলো মেপে মেপে ঐ আলোটা কমছে আলোটা বাড়ছে ঝুপ করে চেঞ্জ হয়ে গেল তেমন নয়। এই গানের সময় বিশু নন্দিনী যখন রাজার ঘরের সামনে সিঁড়ির কাছে কথা বলছে তাদের কথোপকথনের মধ্যে খালেদ চৌধুরী একটা শক্তির প্রতীক হিসেবে একটা ঈগল করেছিলেন। হাফ রিলিফের সেই ঈগলের ওপর দিয়ে তেরছা একটা সোনালী আলো এসে পড়ত এদের ওপর। শিয়ালদহ ম্যানসনে আমরা সেই দিনই গিয়েছি ১০টা / ৭টা Rehearsal পাইনি ছড়মুড় করে গিয়েছি তখন। আর শম্ভুদার বাতিক ছিল Flood light। সেই Flood light একটা নিয়ে খালেদের ঐ শ্বেত পাথরের একটু পিচবোর্ড চুরি করে এনে নারকোল দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়ে বসিয়ে দিলাম বড় বড় দুটো। বড় দৃষ্টি কটু হয়েছিল যদিও। কিন্তু তাতে ছুরি

দিয়ে ফালা ফালা করে কতগুলো ফুটো করেছিলাম। ফুটো করতেই আলোর টুকরো টুকরো ভাঙ্গাচোরা চাঁদের আলো যেমন গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ে সেইরকম আলো সমস্ত Stage-ছড়িয়ে পড়ল। এই আলোটার নাম হয়ে গেল ইকিরিমিকিড়ি। কোন শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না। ইকিরিমিকিড়ি প্যাটার্নের থেকে। এই রকম করে জেনেছি এবং পরে আরও সফিস্টিকিটেড বিলিতি আলো যখন এলো Mirror Spot-pattern 23, Strand Co., সাহেবদের তাকে Gobo স্টেনসিল কেটে ঐ প্যাটার্ণটা করা যায়। তেমনি মেঘ পেছনে আমরা নেট তার ছেঁড়া খোঁড়া গজে, লাইটের সামনে রেখে একটা রঙীন মেঘের আদল আনতাম। পরে যখন বিলেতের Projector cloud পেলাম সেটা চালিয়েছি out focus করে আইফ্যাক্স দিল্লীতে ১৯৫৬ সনে ‘রক্তকরবী’তে।”^{৪৫}

শম্ভু মিত্রের ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনায় আবহ রচনায় আলোর সহায়তা কতখানি কাজে লেগেছিল তা আমরা তাপস সেনের এই স্মৃতিলিপি থেকেই বুঝে নিতে পারি। আলোর প্রয়োগ সঠিকভাবে করার জন্য যেমন তাপস সেনের আলোর ভাবনা সক্রিয় ছিল তেমনি শম্ভু মিত্রের মৌলিক প্রয়োগ ভাবনাও তাতে গভীরভাবে সহায়তা করেছিল। নাট্য প্রয়োগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বরূপ শম্ভু মিত্রের হৃদিস্থিত নাট্য ভাবনায় প্রকাশ ঘটিয়েছিল ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনায়। এই রক্তকরবী প্রযোজনাকে উৎপল দত্ত এক অনবদ্য সৃষ্টি বলে উল্লেখ করে লিখেছেন—

“বহুরূপী বাংলা মঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যটিকে ধরেছেন। এই ঐতিহ্যে আছে দুটি ধারার মিলন প্রথম, দেশজ যাত্রার, দ্বিতীয়, যুরোপীয় বাক্সবন্দী মঞ্চ। পুরো নাটকের কথোপকথনে, যেন একটা সঙ্গীতের উত্থানপতনের মতন কানে আছড়ে পড়তে থাকে, তার মধ্যে শম্ভুবাবুর নিজের উদাত্ত কণ্ঠের যেন সুদূর পর্দায় কতকগুলি চমকপ্রদ তান দিয়ে বৈচিত্র্য আনে গান জমিয়ে দেয়া কঠিন চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেও এই সুরের আর গদ্যছন্দের খেলায় বহুরূপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী;

এখানেই বিশেষ করে তাঁরা খাটি বাঙালী। অন্যপক্ষে যুরোপীয় মঞ্চের প্রোসিনিয়ামের অভ্যন্তরে ইন্দ্রজাল সৃষ্টির অপূর্ব কলাকৌশলও বহুলপরিমাণে এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন শঙ্খ মিত্র। ক্রেগের মতে রং, রেখা ও ছন্দের ঐক্যতান সৃষ্টি হবে প্রকৃত অভিনয়ে। দৃশ্যপটের যেমন রং আছে তেমন রেখাও আছে। এ সবটা এক সুরে, এক রং-এ, এক রেখায়, এক ছন্দে গাঁথবেন পরিচালক। এটাই আধুনিক যুরোপীয় থিয়েটারের প্রধান তত্ত্ব। শঙ্খবাবু দৃঢ় পদে এদিকে পা বাড়িয়েছেন ‘রক্তকরবী’তে।”^{৪৬}

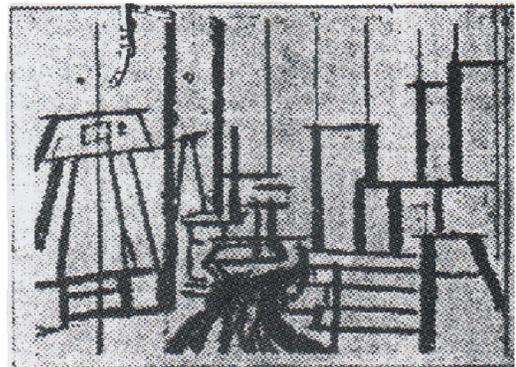
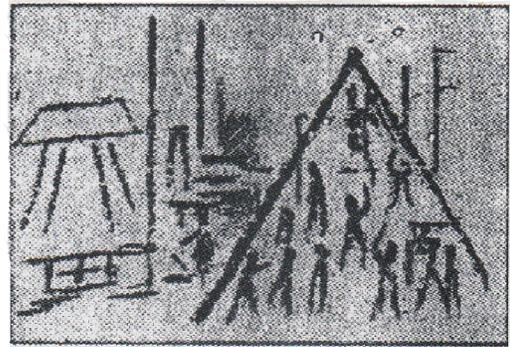
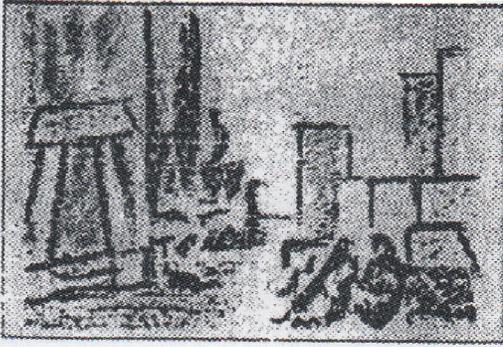
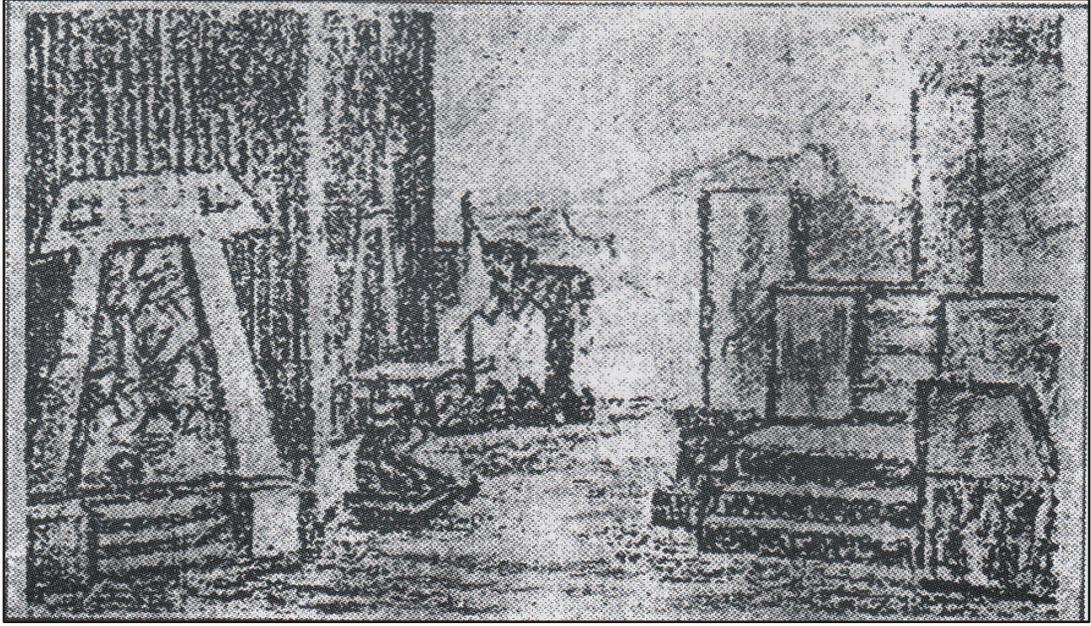
উৎপল দত্তের কথা থেকে আমাদের একথা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, শঙ্খ মিত্রের ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনার সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে ছিল তাঁর সংলাপ সৃজনের উপরেই। ‘রক্তকরবী’র সংলাপ গ্রাম্য বাঙালীর মুখের সংলাপ।

কবি শঙ্খ ঘোষ ‘বহুরূপীর রবীন্দ্রনাথ’ নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন সেখানে তিনি দেখিয়েছেন শঙ্খ মিত্র কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

“রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন এমন কোনো গড়ন যা পশ্চিমের অন্ধনবিশি মাত্র নয়, যার মধ্যে ধরা পড়বে আমাদের জীবন যাপনের বিশেষ মুদ্রাটি। ... এই ভাবনার অনুকূলেই এক এক দেশীয় নাট্যরীতি গড়ে নিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর নাটক চর্চা এক পরোক্ষ ভারত চর্চা।

এই খানেই বহুরূপীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিলন সূত্র। যে নাট্য আন্দোলন থেকে শঙ্খমিত্রের জীবন শুরু হয়েছিল, অথবা যে আন্দোলন থেকে বহুরূপীর জন্ম, তা ছিল একান্তভাবেই দেশ চর্চার সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতার এপারে ওপারে কয়েক বছর জুড়ে আমাদের বুঝে নিতে হচ্ছিল, কিসের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। প্রশ্ন ছিল, আইডেন্টিফিকেশনের, আত্মপরিচয়ের।”^{৪৭}

শঙ্খ মিত্র রক্তকরবীর প্রযোজনার মাধ্যমে খুঁজতে চেয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ কথিত উল্লিখিত,



রক্তকরবী

সংগ্রহ : শিল্প মিত্র রচনা সমগ্র-১
সম্পাদনা-শীওলী মিত্র
আনন্দ পাবলিশার্স
প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৪

আত্মপরিচয়। রক্তকরবীর কাহিনী বর্ণনে, চরিত্র সৃজনে, মঞ্চসজ্জায়, গীতরূপায়ণে সংলাপ সৃষ্টিতে আবহ রচনায় সেই আত্ম পরিচয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ শম্ভু মিত্রের নাট্যবোধকে উজ্জীবিত করে। তার ফলে রক্তকরবী এক যুগান্তকারী সৃষ্টি হয়ে উঠতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করার মত সুযোগ্যা অভিনেত্রী পাননি বলে ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনার মত দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। কিন্তু শম্ভু মিত্রের হাতে ছিল তৃপ্তি মিত্রের ন্যায় সুযোগ্যা ও কুশলী অভিনেত্রী তাই তাঁর কাজটি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। এতদিন যা ছিল অসম্ভব তাঁকে তিনি বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছিলেন। এছাড়াও খালেদ চৌধুরীর আবহ রচনা ও মঞ্চপরিষ্কল্পনা তাপস সেনের আলোক সম্পাত ও শম্ভু মিত্রের প্রযোজনা কৌশল এবং সেই সঙ্গে অভিনেত্রীর পরিপূর্ণ সংযোগ সব মিলিয়ে বহুরূপী প্রযোজিত শম্ভু মিত্র নির্দেশিত ‘রক্তকরবী’ নাট্যাভিনয় আজ এক জীবন্ত প্রবাদ। তাইতো জগন্নাথ ঘোষ জানিয়েছেন—

“এই প্রযোজনার দ্বারা বাংলা মঞ্চ এমন এক দুর্লভ সাফল্যের সূচনা ঘটায় যাকে অতিক্রম করা অনেক নাট্যাগোষ্ঠীর কাছে দুঃস্বপ্ন মাত্র।”^{৪৮}

‘রক্তকরবী’ নাটকটি প্রযোজনার পর বহুরূপীর নির্দেশক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের মনে সাহস বেড়ে যায়। এরপর তাঁরা একে একে রবীন্দ্র নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে। একের পর এক তাঁরা মঞ্চস্থ করে ‘ডাকঘর’, ‘বিসর্জন’, ‘মুক্তধারা’ ও ‘রাজা’। এই নাটকগুলির মধ্যে ‘ডাকঘর’ নাটকটিতে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তৃপ্তি মিত্র। বাকি নাটকগুলির সব কটিতেই শম্ভু মিত্র নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। ‘ডাকঘর’ নাট্য প্রযোজনাটি অসম্ভব রকম সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ‘ডাকঘর’ সাফল্যমণ্ডিত হবার পর শম্ভু মিত্রের নির্দেশনার মঞ্চস্থ হয়েছিল ‘বিসর্জন’ নাটকটি। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় ‘বিসর্জন’ নাটকটি অভিনীত হবার আগে এই নাটকটি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। পরবর্তীকালে নাটকটি নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও মঞ্চস্থ করেছিলেন। অর্থাৎ শম্ভু মিত্র যখন ‘বিসর্জন’ নাটকটি নির্দেশনার কথা ভাবেন তখন তাঁর সম্মুখে দুটি প্রযোজনার অভিজ্ঞতার ইতিহাস

উন্মুক্ত ছিল। বহুরূপীর প্রয়োজনায় শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় ‘বিসর্জন’ প্রথম মঞ্চস্থ হয় নতুন দিল্লীর আইফ্যাক্স হলে ১১ই নভেম্বর ১৯৬১ খ্রী:। তখন রবীন্দ্র শতবর্ষের উৎসব চলছে সমগ্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর রচিত নাটক ‘বিসর্জন’-এর অনেকবার প্রযোজনা করেছেন। ১৯৮৩ খ্রী: ও ১৯০০ খ্রী: তিনি যথাক্রমে ‘ঠাকুরবাড়ির মঞ্চ’-এ এবং ‘সাংগীতিক সমাজ’-এ ‘বিসর্জন’ মঞ্চস্থ করেন। এই দুটি অভিনয়েই রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেই সময়ে প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকা থেকে আমরা সেই অভিনয়ের শৈল্পিক কুশলতার নিদর্শনের কথা জানতে পারি। যদি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন পুনরায় ‘বিসর্জন’ নাটকটির অভিনয় করেছিলেন, তখন তিনি জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহভাজন শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে তাঁর থিয়েটারে বিসর্জন নাটক মঞ্চস্থ করার অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের কথা রাখতে গিয়ে ভাদুড়ী মহাশয় নাট্যমন্দিরে ২৬শে জুন ১৯২৬ খ্রী: ‘বিসর্জন’ মঞ্চস্থ করেন। বলাবাহুল্য সেই প্রযোজনাতেও শিশির কুমার ভাদুড়ী প্রথমদিকে রঘুপতি ও পরবর্তীকালে জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে এই ‘বিসর্জন’ নাটকটিই নির্দেশনার দায়ভার বহুরূপীর প্রয়োজনায় শম্ভু মিত্র নিজ স্বক্কে তুলে নিয়েছিলেন। এই প্রযোজনাতে শম্ভু মিত্র জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর নির্দেশনা ও ভূমিকাভিনয় যে উচ্চগ্রামে পৌঁছেছিল তা আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রশংসা থেকেই জানতে পারি। একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

“The play was flawlessly presented by Bhurupée’s young accomplished artistits under Shambhu Mitra’s imaginative direction.”^{৪৯}

অন্য আর একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

“So much the greater then, my admiration for the produce and his excellent cast, for the play was enjoyable to the heighest degree even without the aid of dialogues. What appealed to

me most was that by some subtle emphasis here and there a rather old theme has been a tremendously contemporary impact.”^{৫০}

‘বিসর্জন’ প্রযোজনার পূর্বে বছরপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের ‘নিউ এম্পায়ার’ মঞ্চে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৯ তারিখে। নাটকটির নির্দেশনায় এবং কংকর ও নাগরিক উভয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন শম্ভু মিত্র। যদিও এর আগেই শম্ভু মিত্র গণনাট্য সংঘে থাকাকালীন সময়ে ‘মুক্তধারা’ পরিচালনা করেছিলেন। যদিও তিনি মনে করেন সেই সময়ে তিনি নাটকটির মূল ভাবনার গভীরে পৌঁছাতে পারেননি। এ বিষয়ে শম্ভু মিত্র স্বয়ং তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন—

“সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণ জানা সত্ত্বেও, মনে হল এ নাটক যেন কোনো পুরাকাহিনীর মতো, আমাদের জীবনের সঙ্গে কোনো সংলগ্নতা নেই। তখন তাই মনে হল যে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়েই আমরা গভীর নাট্যের সৃষ্টিতে পৌঁছে যাবো। যে নাট্য আমাদের আধুনিক কালকে জীবন্ত করে প্রকাশ করবে আমাদের ভারতীয় নাট্যরীতিতেই।”^{৫১}

‘মুক্তধারা’র আলোচ্য নির্দেশায় উক্ত বোধ কি তাহলে পরবর্তীকালে প্রথম গণনাট্য সংঘের প্রযোজনার ১৩ বছর বাদে শম্ভু মিত্রের মন থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল? এ প্রশ্ন সঙ্গত কিন্তু এর উত্তরে শুধু এটুকু বলা যায় যে, ১৯৪৬ খ্রী: শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের অন্তর্নিহিত সামাজিক তত্ত্বের রসদ্যোতকতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেননি। তার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ‘চার অধ্যায়’-এর প্রয়োজনাকাল পর্যন্ত। কিন্তু তিনি যখন ‘মুক্তধারা’র প্রযোজনার কথা ভাবলেন তখন তো তিনি রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে গেছেন। তবু ‘মুক্তধারা’য় শম্ভু মিত্র সাফল্য পাননি। তিনি নিজেই তাঁর কাণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—

“রক্তকরবী করে যখন মনে হল যে, রবীন্দ্র নাটকের হিসেব আমরা বুঝে গিয়েছি, তখনই ‘মুক্তধারা’ করতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হলাম। এই ‘মুক্তধারা’

গণনাট্য সংঘের মরন্তু দশায় একবার চেষ্টা করেছিলাম। সেবারও খারাপ হয়েছিল। একেবারে যাচ্ছে তাই। অথচ বিজন ভট্টাচার্য ছিল বটু, গঙ্গাপদ বসু ছিলেন ধনঞ্জয়, চারুপ্রকাশ ঘোষ ছিলেন রাজা, তবু আমি পারিনি অভিনয়টা সম্মানযোগ্য করতে। বহুবছর পর বহুরূপীতে আবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। বুঝলাম রবীন্দ্রনাথ অতো সহজ নয়, অতো সহজে তাঁকে বুঝে ফেলা যায় না।”^{৫২}

রবীন্দ্রনাথ ‘অতো সহজ নয়’ একথা নিশ্চয় ঠিক। কিন্তু যে নিবিড় অনুরাগ ও আগ্রহ নিয়ে শম্ভু মিত্র ‘চার অধ্যায়’ ও ‘রক্তকরবী’ পাঠ করেছিলেন। সেই নিবিড়তা কি ‘মুক্তধারা’ পাঠে অর্পিত হয়েছিল? তবে সে যাই হোক, নিজের ব্যর্থতা স্বীকারে এমন অকপটতা যথার্থই মহান স্বীকারোক্তির পর্যায়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও নরওয়ে নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের ‘এনিমি অব দি পিপল’ ও ‘ডলস হাউস’ নাটকের বাংলা নাট্য রূপান্তর যথাক্রমে ‘দশচক্র’ ও ‘পুতুলখেলা’ নির্দেশনা করেছিলেন। প্রথম নাটকটিতে বাংলা নাট্য রূপান্তর করেছিলেন শান্তি বসু ও দ্বিতীয়টি শম্ভু মিত্র। ‘দশচক্র’ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীতে মঞ্চস্থ হয় ‘শ্রীরঙ্গমে’ ১লা জুন ১৯৬২ খ্রী: এক বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষিতে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত জাতির অভিনায়ে দশচক্র প্রযোজিত হয়। পূর্বোক্ত নাট্যালিপিতে তাই যথার্থই বলা হয়েছিল ‘দশচক্র’ ইবসেনের ‘দশচক্র’ ইবসেনের ‘এনিমি অব দি পিপল’ এর অনুকরণ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীতে প্রযোজিত প্রথম বিদেশী নাটক। বিদেশী নাটক হলেও শম্ভু মিত্র নাটকটিকে এদেশীয় আদর্শ সজ্জাত করে নির্দেশনা করেছিলেন। বাস্তববাদী থিয়েটারের জনক ইবসেনের কলাকৌশল অনুকরণ না করে দেশীয় নাট্য পদ্ধতিতে তা মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন শম্ভু মিত্র। এই নাট্যনির্দেশনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্র জানিয়েছেন—

“বহুরূপী সম্প্রদায় আমাদের মঞ্চের অভিনয় ধারাতে আগেকার চারখানি নাটকের (সমালোচক কথিত, ‘পথিক’, ‘উলুখাগড়া’, ‘ছেঁড়াতার’ ও

‘চারঅধ্যায়’) সাহায্যে যে বলিষ্ঠ নাট্যশক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন ‘দশচক্র’ সেই শক্তিকে আরো প্রতিষ্ঠিত করে তোলার মতো জোর নিয়ে এসেছে। এবং একথাও বলা অযুক্তি হবে না যে শিল্প পরিকল্পনায় এবং অভিনয়ে এমন মঞ্চ কৃতিত্ব আমাদের দেশে আগেও কখনো হয়েছে কিনা মনে করা সহজ হবে না। ... শম্ভুমিত্র ডাক্তারের ভূমিকায়। এতে বাংলার মঞ্চে উদ্দীপনা এনে দেওয়ার মতো অপূর্ব অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ... ‘দশচক্র’ দীর্ঘকাল মনে রাখবার এবং বাংলা মঞ্চে উদ্দীপনা সঞ্চার করার মতো একটি শক্তিকুশল সৃষ্টি।”^{৫৩}

‘দশচক্র’-এর পর শম্ভুমিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপী প্রযোজনায় ১০ই জানুয়ারী ১৯৫৮ খ্রী: মহাজাতি সদনে মঞ্চস্থ হয় ‘পুতুলখেলা’। আগেই জানিয়েছি এই ইবসেনের ‘A doll’s house’ এই নাটকটির নাট্য রূপান্তর ‘পুতুলখেলা’ লিখেছিলেন শম্ভু মিত্র। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এগারো বছর পর শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। তখন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রস্তুত। নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত। কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থান কোথায়? কোথায় তাদের মুক্তি? কোথায় তাদের স্বাধিকার? —তা নিয়ে ভারতীয় জনগণের মাথাব্যথা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটি মঞ্চস্থ হবার অনেক আগেই লিখেছিলেন ‘স্ত্রীর পত্র’ নামক ছোট গল্প। সেখানে আমরা দেখেছি ভালোবাসাহীন শ্রদ্ধাহীন সমাজ। সংসার ও দাম্পত্য জীবনকে পরিত্যাগ করে মৃগাল চলে যায় পুরীর শ্রীক্ষেত্রে। ‘পুতুলখেলা’র বুলু ও অনুরূপভাবে দাম্পত্য জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ত্যাগ করেছিল স্বামী ও সংসার। ‘পুতুল খেলা’র নির্দেশনায় শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের মৃগালের ভাবনাকেই শিরোধার্য করে নাট্যকর্ম সাধন করতে উদ্যোগী হন। এর থেকেই বোঝা যায় শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্য নির্দেশনায় ছুঁতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমকালীন সমাজ বাস্তবকে। আর তার ফলে তিনি হয়েছেন কালের অগ্রপথিক। ‘পুতুল খেলা’ নির্দেশনা যে যথেষ্ট সুন্দর ও সুচারু হয়েছিল, তা জানা যায় তৎকালীন প্রকাশিত একটি পত্রিকায় সমালোচনা থেকে—

“Sambhu Mitra’s ‘Putul Khela’ retains the terrifying realism

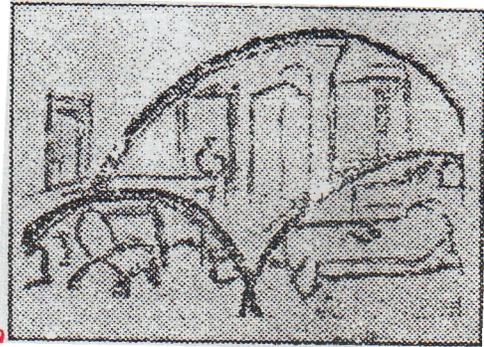
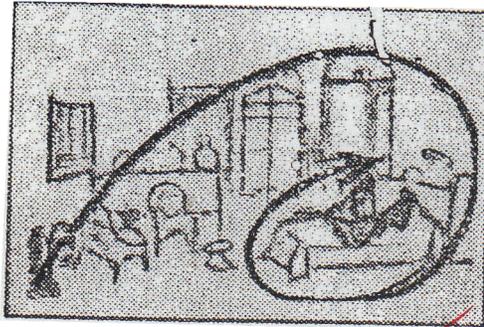
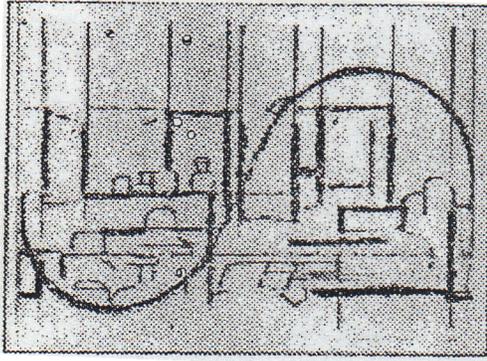
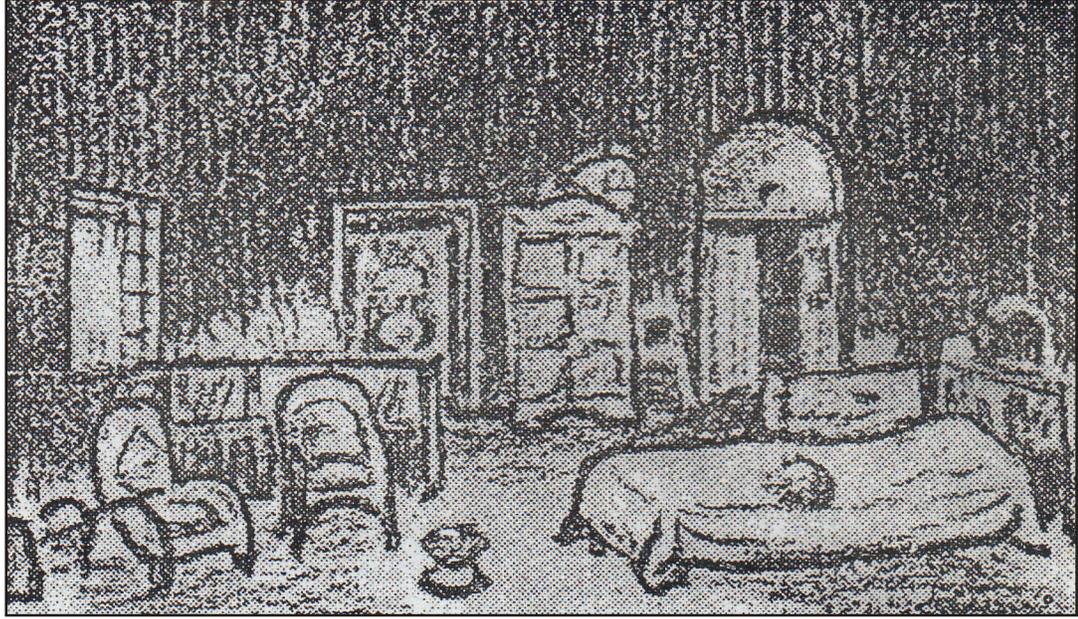
and the dedicate balance of human relationships of Ibsen's A Doll's House. It is as arresting and welknit as the original. In the presentation from beginning to the tremendous beginning to the tremendous tragic finale, through emotions and actions and action tauntless and tension the play is an experience in the theatre”^{৫৪}

এই ‘পুতুল খেলার’ নির্দেশনা প্রসঙ্গে পুর্ণেন্দ পত্রী জানিয়েছেন—

“শম্ভুবাবুর নির্দেশনায় অনেক গভীরতার স্বাদ পাওয়া গিয়েছে। পরাণের সাথে মরণ খেলার কবিতাটিকে কী অসাধারণ বিচক্ষণতায় তিনি জুড়েছেন বুলুর জীবন মরণের সংকটের সঙ্গে।”^{৫৫}

‘পুতুল খেলা’র নির্দেশনায় মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে থাকা খালেদ চৌধুরী শম্ভু মিত্রের নির্দেশিত এই নাটকটিতে নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

“ ‘রক্ত করবী’র পর যখন ‘পুতুল খেলা’র সেট করি তখন ওই রেখাকেই ব্যবহার করলাম। মানুষ আঘাত পেলে ভেঙে পড়ে। অর্থাৎ একটা ডাউন ওয়ার্ড কার্ড-এর চেহারা পাওয়া গেল। মুখোশে হাসি আর কান্নার অভিব্যক্তি বোঝাতে আমরা ঠোঁটের রেখাটিকে কখনোও উপরের দিকে আবার কখনো নিজের দিকে বাঁকিয়ে দিই। ডাউন ওয়ার্ড কার্ডে বেদনার অভিব্যক্তিই ধরা পড়ে। এবার একটা সূক্ষ্ম ব্যবহার করলাম। সেটটা এমনি দেখলে মনে হবে এটা একটা মধ্যবিত্ত বাড়ি। তবে দরজা আছে, জানালা আছে, চেয়ার, আলনা ইত্যাদি নানা আসবাব আছে। প্রত্যেকটা জিনিসে ওই কার্ডটা আছে। ওটা হিসেব করে রাখা হয়েছে। ... নাটকের সুর অনুযায়ী কখনও লাইন এবং কখনোও মাসকে আমি স্পেসের মধ্যে ব্যবহার করে থাকি। ... সেটের প্রাথমিক চিন্তা নাটকের বিষয় থেকে উঠে আসা। তারপরে দেখতে হয় কি ধরনের নাটক।”^{৫৬}



পুতুল খেলা

সংগ্রহ : সন্ধ্যার সপর্ষা - শঙ্কু মিত্র
এম.সি. সরকার অ্যান্ড সঙ্গ প্রাঃ লিঃ
প্রথম সংস্করণ, মার্চ-১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

ইবসেনের ‘এনিমি অব দি পিপল’ এবং ‘A Doll’s House’ নাটকের নাট্য রূপান্তর বহুরূপীর প্রয়োজনায় শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হবার পর গুরুগম্ভীর নাট্য প্রযোজনা ছেড়ে লঘুরসাত্মক নাটক ‘কাঞ্চন রঙ্গ’ অভিনীত হয়। এই নাটকটিতেও নির্দেশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শম্ভুমিত্র। নির্দেশনার পাশাপাশি এই নাটকে শম্ভুমিত্র পাঁচুর ভূমিকায় অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্য নাটকটির তৃতীয় প্রযোজনাতে পাঁচুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নবাগত অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায়। নাটকটি শম্ভু মিত্র অমিত সেনের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচনা করেছিলেন। এই নির্দেশনায় মুগ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

“যদিও লটারীর টাকা এবং ভৃত্য ও পরিচারিকা ইত্যাদি বাঙলা নাটকে আদৌ নতুন নয় এবং সেদিক হইতে খুব মৌলিকও নয় এবং যদিও কোন দৃশ্য সস্তা চমক, রূপে মনে হইতে পারে। তথাপি সামগ্রিক বিচারে ‘কাঞ্চন রঙ্গ’ বহুরূপীর একটি মনোহারী সৃষ্টি। বিশেষতঃ পরিচালক ব্যবস্থাপনা ও অভিনয়ের দিক হইতে নাটকটিকে নিখুঁত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ... ‘কাঞ্চনরঙ্গ’ কাঞ্চনের চেয়ে জীবনরঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে।”^{৫৭}

যুগান্তর পত্রিকার উপরোক্ত এই অভিমতের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে অন্য আর একটি পত্রিকা ‘কাঞ্চন রঙ্গ’ নির্দেশনার প্রসংশা করতে গিয়ে লিখেছে—

“It was a shining and immaculate production which had both pull and attack and several sturdy, animated perpermaness. The keynote was simplicity. The setting had been devised with great economy and the lighting was unvariable throughout. The umphasis was on acting, which had pluenecy and passion।”^{৫৮}

বহুরূপীর প্রয়োজনায় শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় ১৯৬৪ খ্রী: থেকে মঞ্চস্থ হয়েছে ‘অন্ধকারের নাটক।’ বহুরূপী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৪ খ্রী: ১৩ই জুন নিউ এম্পায়ারে সপ্তাহ ব্যাপী এক নাট্যোৎসবে—দুটি নতুন, ‘অন্ধকারের নাটক’—সোফোক্লেসের ‘রাজা’

অয়দিপাউস আর রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’-এর সঙ্গে ছিল আরো পাঁচটি পূর্বাভিনীত নাটক। ‘রাজা’র নির্দেশনা দর্শকদের বিচারে প্রশংসনীয় হয়েছিল এবং হাততালি কুড়িয়ে ছিল। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনার তালিকায় রাজা হল পঞ্চম রবীন্দ্র প্রযোজনা। এই ‘রাজা’ নাটকের নির্দেশনার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দেবতোষ ঘোষ মহাশয় লিখেছেন—

“রাজা সেই প্রযোজনা একটা হীরের টুকরোর সঙ্গেই আক্ষরিক অর্থেই তুলনীয়। হীরের বিভিন্ন কৌণিক দ্যুতির মতোই প্রযোজনার বিভিন্ন অংশ সম্পাদিত নাট্যপাঠ, মঞ্চসজ্জা, পোষাক পরিকল্পনা ও রঙের ব্যবহার। আলোক সম্পাত, গানের বিপুল প্রয়োগ ইত্যাদি সমানভাবেই আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল।”^{৫৯}

রাজার নবনির্মাণে শম্ভু মিত্রের সম্পাদনা (মুদ্রিত নাটকের যা এক তৃতীয়াংশ) বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। নির্মেদ কৃশ এই সম্পাদিত নাট্যাংশে বাদ পড়েছে কান্যকুজরাজ ও মন্ত্রী, রোহিনী। যথেষ্ট সংযোজিত, বর্জিত হয়েছে জনার্দন, কৌণ্ডিল্য, ভবদও এবং আরও অনেক সাধারণ ইতরজন, বাউল ও প্রথমা, দ্বিতীয়া রমনীকুল। এমন কি নাটকের সূচীতীক্ষ্ণতা যাতে কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়ে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল থাকে সেই জন্য বেশকিছু একক সংলাপাংশ বিভিন্ন কণ্ঠে শম্ভু মিত্র ভাগাভাগি করে দিয়েছিলেন এবং এই সম্পাদনার নিপুণত্ব এইখানে যে, নাটকের বক্তব্য বা মূল বিষয় কখনও রবীন্দ্রনাথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে এক বহুতা নদীর মতো তরতর করে বয়ে গেল এক নিরাভরণ মঞ্চের উপর দিয়ে।

রাজার মঞ্চসজ্জা ছিল যথার্থই নিরাভরণ। যবনিকা থেকে তিনফুট মতো পেছনে একটা সিড়ি, যেটা মঞ্চের সমস্ত প্রস্থ জুড়ে বিস্তৃত, তার ওপরে প্রায় সমস্ত মঞ্চ জুড়ে দেড় ফুট উঁচু বিরাট চবুতরা আর সাইক্লোমার কিছু আগে সেখানে এই চবুতরা শেষ হয়। সেখানে টানা লম্বা ছয় ইঞ্চি উঁচু এক ফুট চওড়া একটা পাঁচিল। উল্লিখিত সিড়ি, চবুতরা আর পিছনের এই পাঁচিল সমস্তটাই প্রায় শ্যাওলা সবুজ রঙের কাপড়ে ঢাকা। অন্ধকার কক্ষ বোঝাতে পিছনের ঐ ধাপের গা ঘেঁষে নেমে আসত বিরাট কালো পরদা যেটা মাঝখান থেকে বরাবর ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত খাড়াখাড়া চেরা আবার করভোদ্যান অথবা পথের দৃশ্যে সমস্ত কিছু সরে গিয়ে সাইক্লোরামা পর্যন্ত

সম্পূর্ণ উন্মোচিত। মঞ্চের মূল পাটাতনের ওপর অর্থাৎ মঞ্চের সামনের দিকেই সাধারণ মানুষের অর্থাৎ শম্ভু-সুদন, বিশ্ব বসু, বিরূপাক্ষ, কুম্ভমাধব প্রমুখ চরিত্রের সঙ্গে ঠাকুরদার দৃশ্যগুলি সুবর্ণের দর্শনে জনতার ভিড় ইত্যাদি এই সম্মুখ মঞ্চেই অভিনীত হত। সুদর্শনার কক্ষ বাচ্যপ্রাসাদের দৃশ্যাবলির জন্য নির্দিষ্ট ছিল চবুতরা অংশটি। দেবতোষ ঘোষ মহাশয় এই নাট্য নির্দেশনার অভিনয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

“নাটকের প্রথম দৃশ্যে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে ভাসমান সুদর্শনা-সুরঙ্গ মার অস্ফুট অবয়ব তার অনতি পরেই আবহে অদৃশ্য রাজার চৌম্বক কণ্ঠের সঙ্গে সুদর্শনার দিশাহারা উপস্থিতির রুদ্ধশ্বাস রহস্যময়তা ভেঙে দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরু হত ‘আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা’ গানের সঙ্গে সঙ্গে দিনের প্রখর আলোয়। তারপর লো আর অন্ধকার নাচাতে নাচাতে এ অন্ধকারের নাটক শেষ হত আবার একই গানে, সুষ্ঠু প্রেক্ষিতের পরিবর্তনে এই একই গান যে অন্য অর্থ স্থানে রাজত সদ্য ওঠা সূর্যের ছটায় উদ্ভাসিত সাইক্লোরামাকে পশ্চাৎ পটে রেখে বিভিন্ন পেশার মানুষের নৃত্য মিছিল আর মঞ্চের একেবারে সামনে হিসলুয়েটে সুদর্শনার প্রণতা প্রতিমার ওপর যবনিকা নেমে আসত।”^{৬০}

মঞ্চসজ্জার নিরাভরণতা আর আলোর অসামান্য ব্যবহারের সঙ্গে নাট্য চরিত্রদের পোশাকের একটা বড় ভূমিকা ছিল, যার প্রধান কথায় ছিল পিরিমিতি বোধ। অন্ধকার ঘরের দাসী সুরঙ্গমার কালো শাড়ি, কালো জামা আর রাণী সুদর্শনার পোশাক রাজ্ঞী জনোচিত ঘাঘরা, কাঁচলী ওড়না সবই রঙীন। আর সঙ্গে যথোপযুক্ত অলঙ্কার। সুরঙ্গমা আর সুদর্শনার পোশাকের এই বৈপরীত্য রাজা রাজড়াদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পোশাকেও লক্ষ্যণীয় ছিল। সাধারণ মানুষের পোশাকেও লক্ষ্যণীয় ছিল। সাধারণ মানুষের পোশাক ছিল ধুতি, ফতুয়া, চাদর—আর্টপৌড়ে ভঙ্গিতে পরা। রাজাদের ধুতি চাদর সবই উজ্জ্বল রঙের, বাহারি ঢঙে পরা। মাথায় সোনার মুকুট, পায়ে নাগরা। ঠাকুরদাই দলছাড়া কোরা ধুতি, গেরুয়া জোব্বা আর গেরুয়া চাদর। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় সমস্ত পোশাকে খুব সন্তর্পণে বাঙালিয়ানার সঙ্গে ভারতীয়ত্বের একটা নিপুন মিশেল বর্তমান।

‘রাজা’ প্রযোজনায় শম্ভু মিত্রের এই পোশাক বৈচিত্র্যের কথা প্রসঙ্গে দেবতোষ ঘোষ জানিয়েছেন—

“আমাদের দেশের যাত্রায়, আমাদের দেশের সংস্কৃত নাট্যে, আমাদের দেশের শিল্প চিন্তার ‘ঐতিহ্যের সঠিক উপভোগ’।”^{৬১}

ভারতীয় ঐতিহ্যের সূত্রেই শম্ভু মিত্র এই নির্দেশনায় গানের অসাধারণ ব্যবহার করেছিলেন। আমরা জানি গান নাট্য ক্রিয়াকে ব্যহত না হয়ে পরন্তু নাট্যাবেগকে আরও সমৃদ্ধ করে, মর্মগ্রাহী করে। এই নির্দেশনায় তাই যথার্থই গানের ব্যবহার করেছেন শম্ভু মিত্র। মুদ্রিত নাটকে আছে মোট ছব্বিশটি গান। তার মধ্য থেকে বর্তমান প্রযোজনায় ব্যবহৃত হয়েছিল—আটটি গান, গীতাংশ ও আরো সাতটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের অংশ বিশেষ। এইসব গানের মধ্যে—

ক. আমরা সবাই রাজা। (সম্মেলক)

খ. তো যা বলিস তাই।

গ. আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

ঘ. আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা (সম্মেলক)

ঙ. মম চিন্তে নিতে নৃত্যে। (দ্বৈতপুরুষ কণ্ঠে)

গানগুলি সম্পূর্ণ গাওয়া হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে—‘আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা’ গানটি এই প্রযোজনায় দুবার করে গাওয়া হয়েছিল—দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে এবহুং যবনিকা পতনের আগে। ‘মম চিন্তে নিতে নৃত্যে’ গানটি নাট্য প্রযোজনায় ‘থিম সঙ্’ হিসাবে চারবার করে গাওয়া হয়েছিল। দেবতোষ ঘোষ এই নাট্য নির্দেশনায় ব্যবহৃত গানের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

“নাটকে ব্যবহৃত গানের ক্ষেত্রে ‘রাজা’ আজও অনুপম এবং মূল নাটকের গান বর্জনে ও অন্য গানের সংযোজনে প্রযোজনা সমৃদ্ধতর হয়েছে।”^{৬২}

শম্ভু মিত্রের ‘রাজা’র প্রযোজনা কর্মের সম্ভূ ব্যঞ্জনার বিশ্লেষণ দেখি সমকালীন একটি পত্রিকায়—

“বহুরূপীর অন্যতম শিল্পী শম্ভু মিত্রের নাট্য নির্দেশনা প্রশংসার দাবী রাখে। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকচিত্তকে আবিষ্ট রাখার যে প্রয়াস তার

मध्येइ नाटकेर साफल्य ओ सार्थकता प्रमाणित ह्येछे। राणीर अक्कार घर, नेपथ्य थेके राजार राणी, राजपने नगरबासीर उंसवयात्रा एवं शेष दृश्ये राणीर बन्दी जीवन अवसानेर दृश्य व्याङ्गना दर्शक मने स्मरणीय ह्ये थाकबे।”^{७३}

‘राजा’ निर्देशनार पूर्बेइ शब्दु मित्र ये ‘राजा अयदिपाडस’ नाटकटिर निर्देशना करेछिलेन ताओ ताँके ख्यातिर शीर्षदेशे पौछे दियेछिल। एइ नाटकटि बङ्गानुवादेर पाशापाशि शब्दु मित्र अभिनयेओ अंशग्रहण करेछिलेन। गोलाल हालदार ताँर एकाटि प्रबन्के राजा अयदिपाडस निर्देशनाके ‘दुःसाहस’ बले अभिहित करेछेन। केन दुःसाहस ताँर व्याख्या प्रसङ्गे तिनि उक्त प्रबन्के लिखेछेन—

“नाटकेर विषयबस्तुर सङ्गे अङ्गसि जड़ित ह्छे (अ्याथेनिओ) दृश्यसङ्गा, मङ्गबिन्यास बेश रचना, एमनकि, चालचलन (डिपार्टमेन्ट)। मने राखते हबे एम्पयार रङ्गमङ्गेर परिसर एमन किछु बृहत् नय याते एकाटि ग्रीन थियेटारेर बा ताँर नाटकिय दृश्येर आशानुरूप अनुकूल रचना करा सेखाने संभव। एदिके आयोजन कतदूर साध्य बुबेइ बलते पारछि आमामेदर मते साधारण शिक्षित भारतीय दर्शकेर पङ्के राजा इदिपास एर दृश्यादि यथेष्ठ सयत्न रचित ओ उच्चमानेर प्रतिभात ह्येछे। विशेष विदङ्ग दर्शकेरा ह्यतो ङ्काटि पाबेन, जानिना। पुराङ्गिक आङ्करिक यथार्थ नय। रसानुग दृश्य रचना, साजसङ्गा चालचलनइ आमामेदर पङ्के प्रीतिकर। कारण प्रधान कथा हल Play is thing।”^{७४}

‘राजा अयदिपाडस’-एर प्रयोजनार निर्देशकओ नाट्यरूप दाता शब्दु मित्र बाङ्गा अभिनय ओ मङ्ग सङ्गाके एक दुर्गर ऎक्य बिन्दुते उंकर्षेर चरमे पौछे देवार प्रयासे सार्थक ह्येछिलेन। एइ प्रयास अक्कार थेके आलोय उन्नरणेर प्रयास। तह्येते एकाटि शब्दु मित्रेर एइ नाट्य निर्देशनाके प्रशंसाय भरिये दिये बला ह्येछे—

“The stage setting pillared front of a palace and an intelligent spacing of levels suited the peculiar mixture of granduer and pure simplicity of action which mark the plays It may not be fair to compare the bengali play with the original; But although the translation was ably done in keeping with the poclic spirit of the orginal one missing element was the famous sophoclean irony which in vain was sought by this reviewer in the dialogue. Bahurupee seems t have put all their eggs in the basked of ‘pity and horror’.”^{৬৫}

বহুরূপীতে অন্ধকারের নাটক প্রযোজনার পর মঞ্চস্থ হল বাদল সরকারের অপ্রচলিত প্রথাবিরোধী নাটক, অর্থাৎ ‘উদ্ভট’ বা ‘অ্যাবসার্ড নাটক’, ‘বাকি ইতিহাস’, ‘প্রলাপ’, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ ও ‘পাগলা ঘোড়া’। এছাড়া নীতিশ সেনের ‘বর্বর বাশি’ ও ইয়োনস্কোর ‘গণ্ডার’। যদিও ‘গণ্ডার’র নির্দেশক শব্দ মিত্র ছিলেন না। এই ধরনের নাট্যাভিনয়ের পশ্চাতে ছিল শব্দ মিত্রের সমাজবোধ। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে শব্দ মিত্র নিজেই জানিয়েছেন তাঁর অন্তরের কথা—

“যখন আমাদের মনে হচ্ছে আমাদের দেশ একটা বিপর্যয়ের মধ্যে চলেছে যখন আমাদের প্রচণ্ড চিন্তা হয়েছে যে একটা ব্যক্তিগত মানুষ কি করে নিজের সার্থকতা খুঁজে পাবার চেষ্টা করবে এই দিশেহারা সমাজের মধ্যে তখন আমরা ‘দশচক্র’ করছি। নতুন স্বাদে, নতুন অনুভবে এই চিন্তাটাকে আরো স্পষ্টরূপ করেছি আমরা রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’তে আর সোফোক্রেসের ‘রাজা অয়দিপাউস’-এ।”^{৬৬}

অন্ধকার, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা শব্দ মিত্রের কাম্য নয়। তিনি উত্তরণে বিশ্বাসী। যেখানে একঘেয়েমি, অন্ধকার আর প্রথা সর্বস্বতা বিরাজমান। সেখানে তিনি জ্বালাতে চান আলো, ফোঁটাতে চান রূপ, আনতে চান ব্যঞ্জনা। এই হল নাট্যনির্দেশক শব্দ মিত্রের মর্মবাণী। নাট্যনির্দেশনা ও অভিনয় শিল্পকে

এক উৎকর্ষ বিন্দুতে তিনি মিলিয়েছেন। এই পটভূমি তাঁকে এক বিরল নাট্যবক্তিত্বে পরিণত করেছে। এ প্রসঙ্গে ‘বাকি ইতিহাস’ প্রযোজনার উৎকর্ষ বিশ্লেষণে ‘দেশ’ পত্রিকার মন্তব্য স্মরণযোগ্য—

“শম্ভু মিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনার ছাপ নাটকের প্রতি দৃশ্যেই মেলে। ডিটেল-এর প্রতি তাঁর নজর এবং স্ত্রী মিত্রের বাস্তববোধ লক্ষ্য করার মতো এবং নাট্য প্রযোজনার দিক থেকেও, বিশেষ করে আলো অন্ধকারের ব্যবহার ও দৃশ্য গঠনে (প্রেতাত্মার আগমনের দৃশ্যটি স্মরণীয়) ‘বাকি ইতিহাস’ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।”^{৬৭}

‘বাকি ইতিহাস’ প্রথম মঞ্চস্থ হয় ‘নিউ স্পেয়ারে’ ৭ই মে ১৯৬৭ খ্রীঃ। ‘বাকি ইতিহাসে’র পর বহুরূপীতে প্রযোজিত হয় ‘বর্বর বাঁশি’। ‘বর্বর বাঁশি’র প্রশংসা করে তৎকালীন সময়ে একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

“Sambhu Mitras direction has primarily sought to emphasize the realistic content of the play. Therein his success is undoubted but there is often an overdose of the built-up-tention. Mitras flair for foolproof coaching is reflected in the exceedingly high standard of performance put in by the most of the numbers of the east.”^{৬৮}

বাকি ইতিহাসের পর শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর প্রযোজনার দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয় ‘পাগলা ঘোড়া’ ও ‘চোপ আদালত চলছে’। ‘পাগলা ঘোড়া’ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনার প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭২ খ্রীঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী ‘একাডেমী অফ ফাইন আর্টস’-এর প্রেক্ষাগৃহে। নাটকটির প্রযোজনা কর্মের উৎকর্ষের প্রশংসা করে দেশ পত্রিকায় লেখা হয়—

“প্রসঙ্গত বহুরূপীর প্রযোজনা এবং শম্ভুমিত্রের নাট্যপরিচালনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে রাখি এখানেই। নাটকের শুরুতে মঞ্চ অন্ধকার। শ্মশানের পরিবেশ গঠনে

এবং মেয়েটির ভৌতিক উপস্থিতিতে ওই অন্ধকার ক্ষণটুকু চমৎকার হয়েছে। মঞ্চসজ্জা (খালেদ চৌধুরী কৃত) খুব ভরাট কিছু নয়। তবু যে তারই মধ্যে শ্মশানের পরিবেশ খুঁজে পেয়েছি সেটা নাট্য পরিচালকের অসাধারণ প্রয়োগ কল্পনার গুণে।”^{৬৯}

বহুরূপীতে শম্ভু মিত্রের শেষ নাট্য নির্দেশনা ‘চোপ আদালত চলছে’ নাটকে। মারাঠী নাট্যকার বিজয় তেগুলাকরের এই নাটকটির বাংলা নাট্যরূপান্তর করেছিলেন এস. বি. যোশী ও নীতিশ সেন। নাটকটি শম্ভুমিত্রের নির্দেশনার প্রথম মঞ্চস্থ হয় ৯ ডিসেম্বর ১৯৭২ খ্রী:। নাটকটির বিষয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে শম্ভুমিত্র নাট্য নির্দেশনায় এনেছেন অভিনব মাত্রা। দেশ পত্রিকায় নাট্যনির্দেশনার প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল—

“মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহের দরজা ও কিছু অংশ নিয়ে নাটকটির প্রয়োগ কল্পনা সিদ্ধ করে তুলেছেন পরিচালক শম্ভুমিত্র। নাটকের মূল ধারা এ রস-কৌতুকে ব্যাপ্তি বিষাদে যার পরিসমাপ্ত অটুট থেকে গেছে। কোন মুহূর্তেই নাটকটি ক্লাস্তিকর লাগেনি।”^{৭০}

এটাই শম্ভু মিত্রের শেষ নাট্য নির্দেশনা।

শান্তুমিত্র নিবেদিত কয়েকটি নাটক-এর সাল ভিত্তিক প্রদর্শনী-র পরিসংখ্যান

সাল	রক্তকরবী	পুতুলখেলা	কাঞ্চনরঙ্গ	বিসর্জন	দশচক্র (নবপর্যায়)	চার অধ্যায়	রাজা অয়্যদিপাউস	রাজা	হেঁড়াতার (নবপর্যায়)	বাকি ইতিহাস	বর্ষ বঁশী	পাগলা ঘোড়া	ক্রোপ, আদালত চলছে
১৯৬২	৫	২	২	১২	৩	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯৬৩	৯	৬	৫	১	১০	১	-	-	-	-	-	-	-
১৯৬৪	৪	১০	৪	-	৭	১	৭	৬	-	-	-	-	-
১৯৬৫	২	৩	২	-	৩	২	৬	২	৩	-	-	-	-
১৯৬৬	৫	১১	১	-	৬	২	১১	৭	-	-	-	-	-
১৯৬৭	৭	১০	১	-	১	-	৩	১	-	৯	-	-	-
১৯৬৮	৫	৩	-	-	৩	-	৪	৩	-	৫	-	-	-
১৯৬৯	-	৫	-	-	-	-	৩	৫	-	৪	৬	-	-
১৯৭০	৩	৯	-	-	-	৪	১০	১	-	১	৭	-	-
১৯৭১	-	৩	-	-	-	২	৬	১	-	১	-	২১	৩
১৯৭২	-	-	-	-	১	৩	৯	১	-	-	-	২১	১৯
১৯৭৩	৭	৯	-	-	২	৩	৭	২	-	৬	-	১১	৩
১৯৭৪	৭	৬	-	-	১	-	১৫	৫	-	৫	-	১১	-
১৯৭৫	৬	৭	-	-	-	৪	১২	৩	-	-	-	১৬	-
১৯৭৬	-	২	-	-	-	৩	৪	১	-	২	-	৬	-
১৯৭৭	-	৩	-	-	১	২	৩	৩	-	৫	-	১৩	-
১৯৭৮	-	১	-	-	৪	১	২	২	-	৩	২	১৬	-
১৯৭৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭	-	৭	-
মোট :	৬২	৯০	১৫	১০	২৪	৭২	৪০১	৪১	৩	৭৪	১৫	১২১	২২

আলোচনার পরিশেষে এহেন বলা যায়, শম্ভু মিত্রকে সবাই একবাক্যে সফলতম রবীন্দ্র নাট্য পরিচালক মানলেও শম্ভু মিত্র শুধুমাত্র রবীন্দ্র নাটকেরই নয় অরবীন্দ্র নাটকেরও তিনি সফল পরিচালক। একথা সত্য হতে পারে তিনি রবীন্দ্র নাটকের একমাত্র সফল পরিচালক। রবীন্দ্র নাটক ও সফলতার সঙ্গে অভিনীত হতে পারে তা তিনিই প্রথম প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্র নাটক অবাস্তব, অভিনয় উপযোগী না—রবীন্দ্র নাটকের বিরুদ্ধে এই দোষানুরূপের মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেছেন। প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্র নাটকেও অভিনয়যোগ্য। এবং তিনিই একমাত্র সফলতম রবীন্দ্র নাট্য পরিচালক।

তথ্যসূত্র:

- ১। 'নাটকের রীতি ও প্রয়োগ' গ্রন্থের 'প্রয়োগ বিজ্ঞান ও প্রযোজক অধ্যায়', সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ('বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব', জগন্নাথ ঘোষ, ১ম প্রকাশ, ২রা অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১৪৬)
- ২। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলময়' নাটকের সূচনাংশ, কালিদাস, ('বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব', জগন্নাথ ঘোষ, ১ম প্রকাশ, ২রা অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১৪৬)
- ৩। 'নাট্য প্রযোজনা শীর্ষক নিবন্ধ', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, (দ্র: সায়ক নাট্যপত্র ১লা জুলাই ১৯৯২) ('বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব', জগন্নাথ ঘোষ, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৮, কলকাতা পুস্তক মেলা পৃ. ১৪৭)
- ৪। 'সম্মার্গ সপর্ষা', শম্ভু মিত্র, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোং, পৃ. ৮
- ৫। তদেব, পৃ. ৮
- ৬। 'শিল্পী তিনি কিন্তু অভাব শৃঙ্খলার', সম্পাদনা-নৃপেন্দ্র সাহা, প্রবন্ধ, আশ্বিন ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ
- ৭। 'নবান্ন : অরণি পত্রিকা', ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৪ খ্রি: নিবন্ধটি সংকলিত হয়েছে, ধনঞ্জয় দাস ও সতীন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত নতুন পরিবেশ শারদীয়া ১৩৮৪ সংখ্যায়
- ৮। 'নবান্ন : প্রযোজনা ও প্রভাব' প্রবন্ধ : সুধী প্রধান (১৮৮৯ খ্রী:), পৃ. ৩০
- ৯। তদেব
- ১০। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৪ খ্রি: (জগন্নাথ ঘোষ, 'শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:, পৃ.২১)
- ১১। 'সম্মার্গ সপর্ষা', শম্ভু মিত্র, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, 'শিশির কুমারের প্রয়োগকলা সম্পর্কে' প্রবন্ধ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোং, পৃ. ১০৫
- ১২। 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা'-৪, পৃ. ৩৩০

- ১৩। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ২৮শে অক্টোবর ১৯৪৯ খ্রি: (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.২৭)
- ১৪। ‘ভারত পত্রিকা’, ১৯৫০ খ্রি: ৯ই ডিসেম্বর (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.২৬)
- ১৫। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৫০ খ্রি: ১৫ই সেপ্টেম্বর (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.২৬)
- ১৬। ‘চিত্রবাণী পত্রিকা’, সেপ্টেম্বর ১৯৫০ খ্রি: (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.২৮)
- ১৭। ‘বহুরূপী’, ১৯৪৮ ৮৮ গ্রন্থ (১৯৮৮), পৃ. ২২ (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.২৮)
- ১৮। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ১৯৫০ খ্রি: ১৫ই অক্টোবর (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.২৮)
- ১৯। ‘অঞ্জলি পত্রিকা’, ২রা নভেম্বর ১৯৫০ খ্রি: (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.২৮)
- ২০। ‘বসুমতি পত্রিকা’, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রি: (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.২৯)
- ২১। ‘ভারত পত্রিকা’, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রী: (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.২৯)
- ২২। শব্দু মিত্র : প্রসঙ্গনাট্য (১৯৭১ খ্রী: প্রথম প্রকাশ) ‘কয়েকটি অভিনয়ে জন্মকথা’, প্রবন্ধ পৃ. ১৯৫-১৯৬
- ২৩। ‘The Penguin Dictionary of the Theatre’ (1966) p. 141
(জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.৩০)
- ২৪। ‘বিভাব’ বহুরূপা-৬৯, ১লা মে ১৯৮৮ খ্রি:; কুমার রায় সম্পাদিত
- ২৫। তদেব
- ২৬। ‘ক্লাস ব্যাক প্রবন্ধ’, ‘দেশ’ বিনোদন সংখ্যা ১৩৮১ বঙ্গাব্দ
- ২৭। ‘সন্মার্গ সপরিচয়’, শব্দু মিত্র, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোং, পৃ. ১৮২
- ২৮। জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; কলকাতা পুস্তক মেলা, পৃ.৩৮
- ২৯। ‘সত্যযুগ পত্রিকা’, ২৪শে আগষ্ট ১৯৫১ খ্রি: (জগন্নাথ ঘোষ, ‘শব্দু মিত্রের নাট্যচর্চা’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:; পৃ.৩৮)
- ৩০। তদেব, পৃ. ৩৯

- ৩১। 'সম্মার্গ সপর্যা', শম্ভু মিত্র, গ্রন্থ, 'কিভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল প্রবন্ধ', প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোং, পৃ. ১৮২
- ৩২। জগন্নাথ ঘোষ, 'শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা' গ্রন্থ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী.; কলকাতা পুস্তক মেলা, পৃ.৩৮
- ৩৩। তদেব, পৃ. ৩৯
- ৩৪। 'সম্মার্গ সপর্যা', শম্ভু মিত্র, 'রক্তকরবী প্রসঙ্গে' নিবন্ধ, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোং, পৃ. ১৯
- ৩৫। 'সম্মার্গ সপর্যা', শম্ভু মিত্র, 'রক্তকরবীতে সঙ্গীত প্রয়োগ' প্রবন্ধ, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোং, পৃ. ১০৮
- ৩৬। 'নাটক রক্তকরবী', শম্ভু মিত্র, 'লেখকের নিবেদন অংশ', প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯২ খ্রি:
- ৩৭। 'রক্ত করবীর রূপায়ন' গোপাল হালদার, 'বহুরূপী পত্রিকা' (১লা মে ১৯৮৮ খ্রি:)
- ৩৮। 'শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-১', সম্পাদনা শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ৪২৫-৪২৬
- ৩৯। 'শিশির সান্নিধ্যে', দেবকুমার ঘোষ ও রবি মিত্র, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২ খ্রি.; পৃ. ৮৬
- ৪০। 'একটি স্মরণীয় মিলন', অশোক মজুমদার, বহুরূপী ৭৭, মে ১৯৯২ খ্রি:
- ৪১। 'শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-১', সম্পাদনা শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ৪২৩
- ৪২। 'সম্মার্গ সপর্যা', শম্ভু মিত্র, 'রক্তকরবীতে সঙ্গীত প্রয়োগ' প্রবন্ধ, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোং, পৃ. ১০৮
- ৪৩। জগন্নাথ ঘোষ, 'শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা' গ্রন্থ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী.; কলকাতা পুস্তক মেলা, পৃ.৪৪
- ৪৪। তদেব, পৃ. ৪৪
- ৪৫। তদেব, পৃ. ৪৫
- ৪৬। উৎপল দত্ত, পাদপ্রদীপ, বহুরূপী ও 'রক্তকরবী', আশ্বিন ২৩৬৩ বঙ্গাব্দ (তদেব, পৃ. ৪৬)
- ৪৭। জগন্নাথ ঘোষ, 'শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা' গ্রন্থ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী.; কলকাতা পুস্তক মেলা, পৃ.৪৭
- ৪৮। তদেব, পৃ. ৪৭
- ৪৯। 'Link পত্রিকা', ২৯শে নভেম্বর ১৯৬২ খ্রী: (তদেব, পৃ. ৪৯)
- ৫০। 'Capital পত্রিকা', ২১শে ডিসেম্বর ১৯৬১ খ্রী: (তদেব, পৃ. ৪৯-৫০)

- ৫১। 'সম্মার্গ সপর্ষা', শম্ভু মিত্র, 'কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল' প্রবন্ধ, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোং, পৃ. ১৭৯
- ৫২। 'ফিরে তাকাই' (শম্ভু মিত্র, বহুরূপী-৭০, ১০ই অক্টোবর ১৯৮৮ খ্রি:)
- ৫৩। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ৭ই ডিসেম্বর ১৯৫২ খ্রি:
- ৫৪। 'Thought' পত্রিকা, ১৮ই নভেম্বর ১৯৬১ খ্রি: (জগন্নাথ ঘোষ, 'শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রী:, পৃ.৫৫)
- ৫৫। 'পুতুল খেলা প্রসঙ্গে', পুর্ণেন্দুশেখর পত্রী, 'নতুন সাহিত্য', আশ্বিন ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ
- ৫৬। 'শিল্পের শর্ত', খালেদ চৌধুরী, যোগসূত্র—অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত
- ৫৭। 'যুগান্তর পত্রিকা', ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ খ্রি:
- ৫৮। 'The Time of India' পত্রিকার ১০ই নভেম্বর ১৯৬১ তারিখের সংখ্যা
- ৫৯। শম্ভু মিত্র শ্রীচরণে 'এক অভিনেতার স্মৃতিতে শ্রুতিতে রাজা প্রযোজনা', নিবন্ধ, দেবতোষ ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ২০১৫, পৃ. ৩৯
- ৬০। তদেব, পৃ. ৪০-৪১
- ৬১। তদেব, পৃ. ৪২
- ৬২। তদেব, পৃ. ৪৩
- ৬৩। 'জনসেবক পত্রিকা', ২৬শে জুন ১৯৬৪ খ্রি:
- ৬৪। 'বহুরূপীর রাজা অয়দিপাউস' প্রবন্ধ, গোপাল হালদার, পরিচয় পত্রিকা ৩৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ
- ৬৫। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১২ই জুন ১৯৬৪ খ্রি:
- ৬৬। 'ফিরে তাকাই', শম্ভু মিত্র, বহুরূপী-৭০ (১০ই অক্টোবর ১৯৮৮ খ্রি:) কুমার রায়
- ৬৭। 'দেশ পত্রিকা', ২রা আষাঢ় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ
- ৬৮। 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ২০ই জুন ১৯৬৯ খ্রি:
- ৬৯। 'দেশ পত্রিকা', ২০ই মার্চ ১৯৭১ খ্রি:
- ৭০। 'দেশ পত্রিকা', ৮ই জানুয়ারী ১৯৭২ খ্রী: